গল্প-দশক

গল্প-দশক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা ;

১৩.৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, "সাহিত্য-যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ও

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০২।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

উৎসর্গ।

পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ আশুতোষ চৌধুরীর করকমলে এই গ্রন্থ উপহৃত হইল।

১৫ই ভাদ্র।
১৩০২। } গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

গল্প-দশক।

প্রায়শ্চিত্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝখানে একটা অনির্দ্দেশ্য অরাজক স্থান আছে, যেখানে ত্রিশঙ্কু রাজা ভাসিয়া বেড়াইতেছেন; যেখানে আকাশকুসুমের অজস্র আবাদ হইয়া থাকে। সেই বায়ুদুর্গ-বেষ্টিত মহাদেশের নাম "হইলে-হইতে-পারিত"। যাঁহারা মহৎ কার্য্য করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, যাঁহারা সামান্য ক্ষমতা লইয়া সাধারণ মানবের মধ্যে সাধারণভাবে সংসারের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য সাধনে সহায়তা করিতেছেন, তাঁহারাও ধন্য; কিন্তু যাঁহারা অদৃষ্টের ভ্রমক্রমে হঠাৎ দুয়ের মাঝখানে পড়িয়াছেন তাঁহাদের আর কোন উপায় নাই! তাঁহারা একটা কিছু হইলে হইতে পারিতেন কিন্তু সেই কারণেই তাঁহাদের পক্ষে কিছু একটা হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা অসম্ভব।

আমাদের অনাথবন্ধু সেই মধ্যদেশবিলম্বিত বিধিবিড়ম্বিত যুবক। সকলেরই বিশ্বাস তিনি ইচ্ছা করিলে সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। কিন্তু কোন কালে তিনি ইচ্ছাও করিলেন না, এবং কোন বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্যও হইলেন না এবং সকলের বিশ্বাস তাঁহার প্রতি অটল রহিয়া গেল। সকলে বলিল তিনি পরীক্ষায় ফাষ্ট হইবেন, তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না। সকলের বিশ্বাস, চাকরিতে প্রবিষ্ট হইলে যে কোন ডিপার্টমেণ্টের উচ্চতম স্থান তিনি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবেন,—তিনি কোন চাকরিই গ্রহণ করিলেন না। সাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ অবজ্ঞা, কারণ তাহারা অত্যন্ত সামান্য; অসাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, কারণ মনে করিলেই তিনি তাহাদের অপেক্ষা অসাধারণতর হইতে পারিতেন।

অনাথবন্ধুর সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তিসুখসম্পদসৌভাগ্য দেশকালাতীত অনসম্ভবতার ভাণ্ডারে নিহিত ছিল—বিধাতা কেবল বাস্তবরাজ্যে তাঁহাকে একটি ধনী শ্বশুর এবং একটি সুশীলা স্ত্রী দান করিয়াছিলেন। স্ত্রীর নাম বিন্ধ্যবাসিনী।

স্ত্রীর নামটি অনাথবন্ধু পছন্দ করেন নাই এবং স্ত্রীটিকেও রূপে গুণে তিনি আপন যোগ্য জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীর মনে স্বামিসৌভাগ্যগর্ব্বের সীমা ছিল না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীর অপেক্ষা তাঁহার স্বামী যে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না এবং

তাঁহার স্বামীরও কোন সন্দেহ ছিল না এবং সাধারণের ধারণাও এই বিশ্বাসের অনুকূল ছিল।

এই স্বামিগর্ব্ব পাছে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয়, এজন্য বিন্ধ্যবাসিনী সর্ব্বদাই সশঙ্কিত ছিলেন। তিনি যদি আপন হৃদয়ের অভ্রভেদী অটল ভক্তিপর্ব্বতের উচ্চতম শিখরের উপরে এই স্বামীটিকে অধিরোহণ করাইয়া তাঁহাকে মূঢ় মর্ত্ত্যলোকের সমস্ত কটাক্ষপাত হইতে দূরে রক্ষা করিতে পারিতেন, তবে নিশ্চিন্তচিত্তে পতিপূজায় জীবন উৎসর্গ করিতেন। কিন্তু জড়জগতে কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা ভক্তিভাজনকে উর্দ্ধে তুলিয়া রাখা যায় না এবং অনাথবন্ধুকেও পুরুষের আদর্শ বলিয়া মানে না এমন প্রাণী সংসারে বিরল নহে। এই জন্য বিন্ধ্যবাসিনীকে অনেক দুঃখ পাইতে হইয়াছে।

অনাথবন্ধু যখন কালেজে পড়িতেন তখন শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন। পরীক্ষার সময় আসিল পরীক্ষা দিলেন না এবং তাহার পরবৎসর কালেজ্ ছাড়িয়া দিলেন।

এই ঘটনায় সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বিন্ধ্যবাসিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। রাত্রে মৃদুস্বরে অনাথবন্ধুকে বলিলেন, "পরীক্ষাটা দিলেই ভাল হ'ত!"

অনাথবন্ধু অবজ্ঞাভরে হাসিয়া কহিলেন, "পরীক্ষা দিলেই কি চতুর্ভুজ হয় না কি? আমাদের কেদারও ত পরীক্ষায় পাস্ হইয়াছে।"

বিন্ধ্যবাসিনী সান্ত্বনা লাভ করিলেন। দেশের অনেক

গো-গৰ্দ্দভ যে পরীক্ষায় পাস করিতেছে সে পরীক্ষা দিয়া অনাথবন্ধুর গৌরব কি আর বাড়িবে!

প্রতিবেশিনী কমলা তাহার বাল্যসখী বিন্দিকে আনন্দ সহকারে খবর দিতে আসিল যে, তাহার ভাই রমেশ এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলপানী পাইতেছে। শুনিয়া বিন্ধ্য-বাসিনী অকারণে মনে করিল, কমলার এই আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ নহে, ইহার মধ্যে তাহার স্বামীর প্রতি কিঞ্চিৎ গূঢ় শ্লেষ আছে। এই জন্য সখীর উল্লাসে উল্লাস প্রকাশ না করিয়া বরং গায়ে পড়িয়া কিঞ্চিৎ ঝগড়ার সুরে শুনাইয়া দিল, যে, এল্, এ, পরীক্ষা একটা পরীক্ষার মধ্যেই গণ্য নহে; এমন কি, বিলাতের কোন কালেজে বি, এ,র নীচে পরীক্ষাই নাই।—বলা বাহুল্য, এ সমস্ত সংবাদ এবং যুক্তি বিন্ধ্য স্বামীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে।

কমলা সুখসংবাদ দিতে আসিয়া সহসা পরম প্রিয়তমা প্রাণসখীর নিকট হইতে এরূপ আঘাত পাইয়া প্রথমটা কিছু বিস্মিত হইল। কিন্তু সেও না কি স্ত্রীজাতীয় মনুষ্য, এই জন্য মুহূৰ্ত্তকালের মধ্যেই বিন্ধ্যবাসিনীর মনের ভাব বুঝিতে পারিল এবং ভ্রাতার অপমানে তৎক্ষণাৎ তাহারও রসনাগ্রে একবিন্দু তীব্র বিষ সঞ্চারিত হইল; সে বলিল, আমরা ত ভাই বিলাতেও যাই নাই, সাহেব স্বামীকেও বিবাহ করি নাই অত খবর কোথায় পাইব! মূর্খ মেয়েমানুষ, মোটামুটি এই বুঝি যে, বাঙ্গালীর ছেলেকে কালেজে এল্, এ, দিতে হয়;—

তাও ত ভাই সকলে পারে না। অত্যন্ত নিরীহ এবং সুমিষ্ট বন্ধুভাবে এই কথাগুলি বলিয়া কমলা চলিয়া আসিল। কলহবিমুখ বিন্ধ্য নিরুত্তরে সহ্য করিল এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

অল্পকালের মধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিল। একটি দূরস্থ ধনী কুটুম্ব কিয়ৎকালের জন্য কলিকাতায় আসিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তদুপলক্ষে তাহার পিতা রাজকুমার বাবুর বাড়ীতে বিশেষ একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। জামাই বাবু বাহিরের যে বড় বৈঠকখানাটি অধিকার করিয়া থাকিতেন নবঅভ্যাগতদের বিশেষ সমাদরের জন্য সেই ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে মামা বাবুর ঘরে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় লইতে অনুরোধ করা হইল।

এই ঘটনায় অনাথবন্ধুর অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ স্ত্রীর নিকট গিয়া তাহার পিতৃনিন্দা করিয়া তাহাকে কাঁদাইয়া দিয়া শ্বশুরের উপর প্রতিশোধ তুলিলেন। তাহার পরে অনাহার প্রভৃতি অন্যান্য প্রবল উপায়ে অভিমানপ্রকাশের উপক্রম করিলেন। তাহা দেখিয়া বিন্ধ্যবাসিনী নিরতিশয় লজ্জিত হইল। তাহার মনে যে একটি সহজ আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল, তাহা হইতেই সে বুঝিল, এরূপ স্থলে সর্ব্বসমক্ষে অভিমান প্রকাশ করার মত লজ্জাকর আত্মাবমাননা আর কিছুই নাই। হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বহু কষ্টে সে তাহার স্বামীকে ক্ষান্ত করিয়া রাখিল।

বিন্ধ্য অবিবেচক ছিল না, এই জন্য সে তাহার পিতা মাতার প্রতি কোন দোষারোপ করিল না; সে বুঝিল ঘটনাটি সামান্য ও স্বাভাবিক; কিন্তু এ কথাও তাহার মনে হইল যে, তাহার স্বামী শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া কুটুম্বের আদর হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

সেই দিন হইতে প্রতিদিন সে তাহার স্বামীকে বলিতে লাগিল, আমাকে তোমাদের ঘরে লইয়া চল; আমি আর এখানে থাকিব না।

অনাথবন্ধুর মনে অহঙ্কার যথেষ্ট ছিল কিন্তু আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল না। তাঁহার নিজগৃহের দারিদ্র্যের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কিছুতেই তাঁহার অভিরুচি হইল না। তখন তাঁহার স্ত্রী কিছু দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া কহিল, তুমি যদি না যাও ত আমি একলাই যাইব।

অনাথবন্ধু মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে কলিকাতার বাহিরে দূর ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহাদের মৃত্তিকানির্ম্মিত খোড়ো ঘরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। যাত্রাকালে রাজকুমার বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী, কন্যাকে আরও কিছুকাল পিতৃগৃহে থাকিয়া যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন; কন্যা নীরবে নতশিরে গম্ভীর মুখে বসিয়া মৌনভাবে জানাইয়া দিল—না, সে হইতে পারিবে না!

তাহার সহসা এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পিতা মাতার সন্দেহ হইল যে, অজ্ঞাতসারে বোধ করি কোনরূপে তাহাকে

আঘাত দেওয়া হইয়াছে। রাজকুমার বাবু ব্যথিতচিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, আমাদের কোন অজ্ঞানকৃত আচরণে তোমার মনে কি ব্যথা লাগিয়াছে?

বিন্ধ্যবাসিনী তাহার পিতার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল, এক মুহূর্ত্তের জন্যও নহে। তোমাদের এখানে বড় সুখে বড় আদরে আমার দিন গিয়াছে!—বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল! কিন্তু তাহার সংকল্প অটল রহিল।

বাপ মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, যত স্নেহে যত আদরেই মানুষ কর, বিবাহ দিলেই মেয়ে পর হইয়া যায়।

অবশেষে অশ্রুনেত্রে সকলের নিকট বিদায় লইয়া আপন আজন্মকালের স্নেহমণ্ডিত পিতৃগৃহ এবং পরিজন ও সঙ্গিনী-গণকে ছাড়িয়া বিন্ধ্যবাসিনী পাল্কীতে আরোহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার ধনিগৃহে এবং পল্লিগ্রামের গৃহস্থঘরে বিস্তর প্রভেদ। কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনী একদিনের জন্যও ভাবে অথবা আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। প্রফুল্লচিত্তে গৃহকার্য্যে শাশুড়ির সহায়তা করিতে লাগিল। তাহাদের দরিদ্র অবস্থা জানিয়া পিতা নিজব্যয়ে কন্যার সহিত একটি দাসী পাঠাইয়াছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী স্বামিগৃহে পৌঁছিয়াই তাহাকে বিদায়

করিয়া দিল। তাহার শ্বশুর-ঘরের দারিদ্র্য দেখিয়া বড়মানুষের ঘরের দাসী প্রতিমুহূর্ত্তে মনে মনে নাসাগ্র আকুঞ্চিত করিতে থাকিবে, এ আশঙ্কাও তাহার অসহ্য বোধ হইল।

শ্বাশুড়ি স্নেহবশতঃ বিন্ধ্যকে শ্রমসাধ্য কার্য্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বিন্ধ্য নিরলস অশ্রান্তভাবে প্রসন্নমুখে সকল কার্য্যে যোগ দিয়া শ্বাশুড়ির হৃদয় অধিকার করিয়া লইল এবং পল্লীরমণীগণ তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু ইহার ফল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইল না। কারণ, বিশ্বনিয়ম নীতিবোধ প্রথমভাগের ন্যায় সাধুভাষায় রচিত সরল উপদেশাবলী নহে; নিষ্ঠুর বিদ্রূপপ্রিয় সয়তান মাঝখানে আসিয়া সমস্ত নীতিসূত্রগুলিকে ঘাঁটিয়া জট পাকাইয়া দিয়াছে। তাই ভাল কাজে সকল সময়ে উপস্থিতমত বিশুদ্ধ ভাল ফল ঘটে না, হঠাৎ একটা গোল বাধিয়া ওঠে।

অনাথবন্ধুর দুইটি ছোট এবং একটি বড় ভাই ছিল। বড় ভাই বিদেশে চাকরি করিয়া যে গুটিপঞ্চাশেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই তাহাদের সংসার চলিত এবং ছোট দুটি ভাইয়ের বিদ্যাশিক্ষা হইত।

বলা বাহুল্য, আজকালকার দিনে মাসিক পঞ্চাশ টাকায় সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন অসম্ভব, কিন্তু বড় ভাইয়ের স্ত্রী শ্যামাশঙ্করীর গরিমাবৃদ্ধির পক্ষে উহাই যথেষ্ট ছিল। স্বামী সম্বৎসর কাল কাজ করিতেন, এই জন্য স্ত্রী সম্বৎসরকাল বিশ্রামের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাজকর্ম্ম কিছুই করিতেন না,

অথচ এমন ভাবে চলিতেন, যেন তিনি কেবলমাত্র তাঁহার উপার্জ্জনক্ষম স্বামীটির স্ত্রী হইয়াই সমস্ত সংসারটাকে পরম বাধিত করিয়াছেন।

বিন্ধ্যবাসিনী যখন শ্বশুরবাড়ি আসিয়া গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় অহর্নিশি ঘরের কাজে প্রবৃত্ত হইল তখন শ্যামাশঙ্করীর সঙ্কীর্ণ অন্তঃকরণটুকু কে যেন আঁটিয়া ধরিতে লাগিল। তাহার কারণ বোঝা শক্ত। বোধ করি বড় বৌ মনে করিলেন, মেজবৌ বড় ঘরের মেয়ে হইয়া কেবল লোক দেখাইবার জন্য ঘরকন্নার নীচ কাজে নিযুক্ত হইয়াছে, উহাতে কেবল তাঁহাকে লোকের চক্ষে অপদস্থ করা হইতেছে। যে কারণেই হউক, মাসিক পঞ্চাশ টাকার স্ত্রী কিছুতেই ধনিবংশের কন্যাকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার নম্রতার মধ্যে অসহ্য দেমাকের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন।

এদিকে অনাথবন্ধু পল্লীতে আসিয়া লাইব্রেরী স্থাপন করিলেন; দশ বিশ জন স্কুলের ছাত্র জড় করিয়া সভাপতি হইয়া খবরের কাগজে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে লাগিলেন; এমন কি, কোন কোন ইংরাজী সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদ-দাতা হইয়া গ্রামের লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু দরিদ্র সংসারে একপয়সা আনিলেন না, বরঞ্চ বাজে খরচ অনেক হইতে লাগিল।

একটা কোন চাকরী লইবার জন্য বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহাকে সর্ব্বদাই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তিনি কান দিলেন না।

স্ত্রীকে বলিলেন, তাঁহার উপযুক্ত চাক্‌রী আছে বটে কিন্তু পক্ষপাতী ইংরাজ গবর্মেণ্ট সে সকল পদে বড় বড় ইংরাজকে নিযুক্ত করে, বাঙ্গালী হাজার যোগ্য হইলেও তাহার কোন আশা নাই।

শ্যামাশঙ্করী তাঁহার দেবর এবং মেঝযা'র প্রতি লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে সর্ব্বদাই বাক্যবিষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। গর্ব্বভরে নিজেদের দারিদ্র্য আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা গরীব মানুষ, বড়মানুষের মেয়ে এবং বড়-মানুষের জামাইকে পোষণ করিব কেমন করিয়া? সেখানে ত বেশ ছিলেন কোন দুঃখ ছিল না—এখানে ডালভাত খাইয়া এত কষ্ট কি সহ্য হইবে?

শাশুড়ি বড়বৌকে ভয় করিতেন, তিনি দুর্ব্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করিতেন না। মেজ-বৌও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের ডালভাত এবং তদীয় স্ত্রীর বাক্য ঝাল খাইয়া নীরবে পরিপাক করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বড় ভাই ছুটিতে কিছুদিনের জন্য ঘরে আসিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে অনেক উদ্দীপনাপূর্ণ ওজোগুণসম্পন্ন বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিদ্রার ব্যাঘাত যখন প্রতিরাত্রেই গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন এক দিন অনাথবন্ধুকে ডাকিয়া শান্তভাবে স্নেহের সহিত কহিলেন, তোমার একটা চাক্‌রির চেষ্টা দেখা উচিত, কেবল আমি একলা সংসার চালাইব কি করিয়া?

অনাথবন্ধু পদাহত সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, দুই বেলা দুই মুষ্টি অত্যন্ত অখাদ্য মোটা ভাতের পর এত খোঁটা সহ্য হয় না। তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি যাইতে সংকল্প করিলেন।

কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই সম্মত হইল না। তাহার মতে ভাইয়ের অন্ন এবং ভাজের গালিতে কনিষ্ঠের পারিবারিক অধিকার আছে কিন্তু শ্বশুরের আশ্রয়ে বড় লজ্জা। বিন্ধ্যবাসিনী শ্বশুরবাড়িতে দীনহীনের মত নত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বাপের বাড়িতে সে আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মাথা তুলিয়া চলিতে চায়।

এমন সময় গ্রামের এণ্ট্রেন্সস্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি হইল। অনাথবন্ধুর দাদা এবং বিন্ধ্যবাসিনী উভয়েই তাঁহাকে এই কাজটি গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তাহাতেও হিতে বিপরীত হইল। নিজের ভাই এবং একমাত্র ধর্ম্মপত্নী যে তাঁহাকে এমন একটা অত্যন্ত তুচ্ছ কাজের যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার মনে দুর্জ্জয় অভিমানের সঞ্চার হইল এবং সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্মের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বৈরাগ্য জন্মিয়া গেল!

তখন আবার দাদা তাঁহার হাতে ধরিয়া মিনতি করিয়া তাঁহাকে অনেক করিয়া ঠাণ্ডা করিলেন। সকলেই মনে করিলেন, ইহাকে আর কোন কথা বলিয়া কাজ নাই, এ এখন কোন প্রকারে ঘরে টিঁকিয়া গেলেই ঘরের সৌভাগ্য।

ছুটি অন্তে দাদা কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন; শ্যামাশঙ্করী রুদ্ধ আক্রোশে মুখখানা গোলাকার করিয়া তুলিয়া একটা বৃহৎ কুদর্শন চক্র নির্ম্মাণ করিয়া রহিলেন। অনাথবন্ধু বিন্ধ্য-বাসিনীকে আসিয়া কহিলেন, আজকাল বিলাতে না গেলে কোন ভদ্র চাকরী পাওয়া যায় না। আমি বিলাতে যাইতে মনস্থ করিতেছি, তুমি তোমার বাবার কাছ হইতে কোন ছুতায় কিছু অর্থ সংগ্রহ কর।

এক.ত বিলাত যাইবার কথা শুনিয়া বিন্ধ্যর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল; তাহার পরে পিতার কাছে কি করিয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে যাইবে, তাহা সে মনে করিতে পারিল না এবং মনে করিতে গিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল।

শ্বশুরের কাছে নিজমুখে টাকা চাহিতেও অনাথবন্ধুর অহ-ঙ্কারে বাধা দিল, অথচ বাপের কাছ হইতে কন্যা কেন যে ছলে অথবা বলে অর্থ আকর্ষণ করিয়া না আনিবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ইহা লইয়া অনাথ অনেক রাগা-রাগি করিলেন এবং মর্ম্মপীড়িত বিন্ধ্যবাসিনীকে বিস্তর অশ্রু-পাত করিতে হইল।

এমনি করিয়া কিছুদিন সাংসারিক অভাবে এবং মনের কষ্টে কাটিয়া গেল।

অবশেষে শরৎকালে পূজা নিকটবর্ত্তী হইল। কন্যা এবং জামাতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনিবার জন্য রাজকুমার বাবু বহুসমারোহে যানবাহনাদি প্রেরণ করিলেন। এক বৎসর

পরে কন্যা স্বামী সহ পুনরায় পিতৃভবনে প্রবেশ করিল। ধনী কুটুম্বের যে আদর তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল, জামাতা এবার তদপেক্ষা অনেক বেশি আদর পাইলেন। বিন্ধ্যবাসিনীও অনেককাল পরে মাথার অবগুণ্ঠন ঘুচাইয়া অহর্নিশি স্বজন-স্নেহে ও উৎসবতরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

আজ ষষ্ঠী। কাল সপ্তমী পূজা আরম্ভ হইবে। ব্যস্ততা এবং কোলাহলের সীমা নাই। দূর এবং নিকটসম্পর্কীয় আত্মীয় পরিজনে অট্টালিকার প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ একেবারে পরিপূর্ণ।

সে রাত্রে বড় শ্রান্ত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী শয়ন করিল। পূর্ব্বে যে ঘরে শয়ন করিত এ সে ঘর নহে; এবার বিশেষ আদর করিয়া মা জামাতাকে তাঁহার নিজের ঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনাথবন্ধু কখন্ শয়ন করিতে আসিলেন তাহা বিন্ধ্য জানিতেও পারিল না। সে তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল।

খুব ভোরের বেলা হইতে শানাই বাজিতে লাগিল। কিন্তু ক্লান্তদেহ বিন্ধ্যবাসিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। কমল এবং ভুবন দুই সখী বিন্ধ্যর শয়নদ্বারে আড়ি পাতিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া অবশেষে পরিহাসপূর্ব্বক বাহির হইতে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; তখন বিন্ধ্য তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার স্বামী কখন্ উঠিয়া গিয়াছেন সে জানিতে পারে নাই। লজ্জিত হইয়া শয্যা ছাড়িয়া নামিয়া দেখিল

তাহার মাতার লোহার সিন্ধুক খোলা এবং তাহার মধ্যে তাহার বাপের যে ক্যাশবাক্সটি থাকিত, সেটিও নাই।

তখন মনে পড়িল, কাল সন্ধ্যাবেলায় মায়ের চাবির গোচ্ছা হারাইয়া গিয়া বাড়ীতে খুব একটা গোলোযোগ পড়িয়া গিয়াছিল। সেই চাবি চুরি করিয়া কোন একটি চোর এই কাজ করিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তখন হঠাৎ আশঙ্কা হইল, পাছে সেই চোর তাহার স্বামীকে কোনরূপ আঘাত করিয়া থাকে! বুক্‌টা ধড়াস্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বিছানার নীচে খুঁজিতে গিয়া দেখিল, খাটের পায়ের কাছে তাহার মায়ের চাবির গোচ্ছার নীচে একটি চিঠি চাপা রহিয়াছে।

চিঠি তাহার স্বামীর হস্তাক্ষরে লেখা। খুলিয়া পড়িয়া জানিল, তাহার স্বামী তাহার কোন এক বন্ধুর সাহায্যে বিলাতে যাইবার জাহাজভাড়া সংগ্রহ করিয়াছে; এক্ষণে সেখানকার খরচপত্র চালাইবার অন্য কোন উপায় ভাবিয়া না পাওয়াতে গতরাত্রে শ্বশুরের অর্থ অপহরণ করিয়া বারান্দা-সংলগ্ন কাঠের সিঁড়ি দিয়া অন্দরের বাগানে নামিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অদ্যই প্রত্যুষে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছে।

পত্রখানা পাঠ করিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হইয়া গেল। সেইখানেই খাটের খুরা ধরিয়া সে বসিয়া পড়িল। তাহার দেহের অভ্যন্তরে কর্ণকুহরের মধ্যে নিস্তব্ধ

মৃত্যুরজনীর ঝিল্লিধ্বনির মত একটা শব্দ হইতে লাগিল। তাহারই উপরে, প্রাঙ্গণ হইতে, প্রতিবেশীদের বাড়ী হইতে এবং দূর অট্টালিকা হইতে বহুতর শানাই বহুতর সুরে তান ধরিল। সমস্ত বঙ্গদেশ তখন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শরতের উৎসব-হাস্য-রঞ্জিত রৌদ্র সকৌতুকে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। এত বেলা হইল তথাপি উৎসবের দিনে দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ভুবন ও কমল উচ্চহাস্যে উপহাস করিতে করিতে গুম্ গুম্ শব্দে দ্বারে কিল্ মারিতে লাগিল। তাহাতেও কোন সাড়া না পাইয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া ঊর্দ্ধকণ্ঠে "বিন্দী" "বিন্দী" করিয়া ডাকিতে লাগিল।

বিন্ধ্যবাসিনী ভগ্নরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "যাচ্চি; তোরা এখন যা!"

তাহারা সখীর পীড়া আশঙ্কা করিয়া মাকে ডাকিয়া আনিল। মা আসিয়া কহিলেন,—"বিন্দু, কি হয়েছে মা—এখনো দ্বার বন্ধ কেন!"

বিন্ধ্য উচ্ছ্বসিত অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিল, "একবার বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে এস!"

মা অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজকুমার বাবুকে সঙ্গে করিয়া দ্বারে আসিলেন। বিন্ধ্য দ্বার খুলিয়া তাঁহাদিগকে ঘরে আনিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

তখন বিন্ধ্য ভূমিতে পড়িয়া তাহার বাপের পা ধরিয়া বক্ষ শতধা বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "বাবা!

আমাকে মাপ কর, আমি তোমার সিন্ধুক হইতে টাকা চুরি করিয়াছি।”

তাঁহারা অবাক্ হইয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলেন। বিন্ধ্য বলিল, তাহার স্বামীকে বিলাতে পাঠাইবার জন্য সে এই কাজ করিয়াছে।

তাহার বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাদের কাছে চাহিস্ নাই কেন?”

বিন্ধ্যবাসিনী কহিল, “পাছে বিলাত যাইতে তোমরা বাধা দেও!”

রাজকুমার বাবু অত্যন্ত রাগ করিলেন। মা কাঁদিতে লাগিলেন, মেয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং কলিকাতার চতুর্দ্দিক হইতে বিচিত্র সুরে আনন্দের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

যে বিন্ধ্য বাপের কাছেও কখনও অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে নাই এবং যে স্ত্রী স্বামীর লেশমাত্র অসম্মান পরমাত্মীয়ের নিকট হইতেও গোপন করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে পারিত, আজ একেবারে উৎসবের জনতার মধ্যে তাহার পত্নী-অভিমান, তাহার দুহিতৃসম্ভ্রম, তাহার আত্মমর্য্যাদা চূর্ণ হইয়া প্রিয় এবং অপ্রিয়, পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের পদতলে ধূলির মত লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পূর্ব্ব হইতে পরামর্শ করিয়া, ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক চাবি চুরি করিয়া, স্ত্রীর সাহায্যে রাতারাতি অর্থ অপহরণপূর্ব্বক অনাথবন্ধু বিলাতে পলায়ন করিয়াছে, এ কথা লইয়া আত্মীয়কুটুম্বপরিপূর্ণ বাড়ীতে একটা ঢী ঢী পড়িয়া

গেল। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ভুবন, কমল এবং আরও অনেক স্বজন প্রতিবেশী দাস দাসী সমস্ত শুনিয়াছিল। রুদ্ধদ্বার জামাতৃগৃহে উৎকণ্ঠিত কর্ত্তাগৃহিণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই কৌতূহলে এবং আশঙ্কায় ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছিল।

বিন্ধ্যবাসিনী কাহাকেও মুখ দেখাইল না। দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনাহারে বিছানায় পড়িয়া রহিল। তাহার সেই শোকে কেহ দুঃখ অনুভব করিল না। ষড়যন্ত্রকারিণীর দুষ্ট বুদ্ধিতে সকলেই বিস্মিত হইল। সকলেই ভাবিল, বিন্ধ্যর চরিত্র এতদিন অবসরাভাবে অপ্রকাশিত ছিল। নিরানন্দ গৃহে পূজার উৎসব কোন প্রকারে সম্পন্ন হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অপমান এবং অবসাদে অবনত হইয়া বিন্ধ্য শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়া আসিল। সেখানে পুত্রবিচ্ছেদকাতরা বিধবা শ্বাশুড়ির সহিত পতিবিরহবিধুরা বধূর ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপিত হইল। উভয়ে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া নীরব শোকের ছায়াতলে সুগভীর সহিষ্ণুতার সহিত সংসারের সমস্ত তুচ্ছতম কার্য্যগুলি পর্য্যন্ত স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। শ্বাশুড়ি যে পরিমাণে কাছে আসিল পিতামাতা সেই পরিমাণে দূরে চলিয়া গেল। বিন্ধ্য মনে মনে অনুভব করিল, শ্বাশুড়ি দরিদ্র, আমিও দরিদ্র, আমরা এক দুঃখবন্ধনে বদ্ধ;

পিতামাতা ঐশ্বর্য্যশালী, তাঁহারা আমাদের অবস্থা হইতে অনেক দূরে। একে দরিদ্র বলিয়া বিন্ধ্য তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক দূরবর্ত্তী, তাহাতে আবার চুরি স্বীকার করিয়া সে আরও অনেক নীচে পড়িয়া গিয়াছে। স্নেহসম্পর্কের বন্ধন এত অধিক পার্থক্যভার বহন করিতে পারে কি না কে জানে!

অনাথবন্ধু বিলাত গিয়া প্রথম প্রথম স্ত্রীকে রীতিমত চিঠি পত্র লিখিতেন। কিন্তু ক্রমেই চিঠি বিরল হইয়া আসিল, এবং পত্রের মধ্যে একটা অবহেলার ভাব অলক্ষিতভাবে প্রকাশ হইতে লাগিল। তাঁহার অশিক্ষিতা গৃহকার্য্যরতা স্ত্রীর অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিরূপগুণ সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠতর অনেক ইংরাজকন্যা অনাথবন্ধুকে সুযোগ্য, সুবুদ্ধি এবং সুরূপ বলিয়া সমাদর করিত; এমত অবস্থায় অনাথবন্ধু আপনার একবস্ত্রপরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী অগৌরবর্ণা স্ত্রীকে কোন অংশেই আপনার সমযোগ্য জ্ঞান করিবেন না ইহাতে বিচিত্র নাই।

কিন্তু, তথাপি যখন অর্থের অনটন হইল, তখন এই নিরুপায় বাঙ্গালীর মেয়েকেই টেলিগ্রাফ করিতে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হইল না। এবং এই বাঙ্গালীর মেয়েই দুই হাতে কেবল দুই গাছি কাঁচের চুড়ী রাখিয়া গায়ের সমস্ত গহনা বেচিয়া টাকা পাঠাইতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ে নিরাপদে রক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান নাই বলিয়া তাহার সমস্ত বহুমূল্য গহনাগুলি পিতৃগৃহে ছিল। স্বামীর কুটুম্বভবনে নিমন্ত্রণে যাইবার ছল করিয়া নানা উপলক্ষে বিন্ধ্যবাসিনী একে একে সকল গহ-

সাই আনাইয়া লইল। অবশেষে হাতের বালা, রূপার চুড়ী, বেনারসি সাড়ী এবং শাল পর্য্যন্ত বিক্রয় শেষ করিয়া বিস্তর বিনীত অনুনয়পূর্ব্বক মাথায় দিব্য দিয়া, অশ্রুজলে পত্রের প্রত্যেক অক্ষর পংক্তি বিকৃত করিয়া বিন্ধ্য স্বামীকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিল।

স্বামী চুল খাট করিয়া দাড়ি কামাইয়া কোট্‌প্যাণ্ট্‌লুন্‌ পরিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং হোটেলে আশ্রয় লইলেন। পিতৃগৃহে বাস করা অসম্ভব, প্রথমতঃ উপ-যুক্ত স্থান নাই, দ্বিতীয়তঃ পল্লিবাসী দরিদ্র গৃহস্থ জাতিনষ্ট হইলে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে। শ্বশুরগণ আচারনিষ্ঠ পরম হিন্দু; তাঁহারাও জাতিচ্যুতকে আশ্রয় দিতে পারেন না।

অর্থাভাবে অতি শীঘ্রই হোটেল হইতে বাসায় নামিতে হইল। সে বাসায় তিনি স্ত্রীকে আনিতে প্রস্তুত নহেন। বিলাত হইতে আসিয়া স্ত্রী এবং মাতার সহিত কেবল দিন দুই তিন দিনের বেলায় দেখা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

দুইটি শোকার্ত্তা রমণীর কেবল এক সান্ত্বনা ছিল যে, অনাথবন্ধু স্বদেশে আত্মীয়বর্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে আছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনাথবন্ধুর অসামান্য ব্যারিষ্টরী কীর্ত্তিতে তাহাদের মনে গর্ব্বের সীমা রহিল না। বিন্ধ্যবাসিনী আপনাকে যশস্বী স্বামীর অযোগ্য স্ত্রী বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল, পুনশ্চ অযোগ্য বলিয়াই স্বামীর অহঙ্কার অধিক করিয়া অনুভব

করিল। সে দুঃখে পীড়িত এবং গর্ব্বে বিস্ফারিত হইল। ম্লেচ্ছ আচার সে ঘৃণা করে, তবু স্বামীকে দেখিয়া মনে মনে কহিল, আজ কাল ঢের লোক ত সাহেব হয়, কিন্তু এমন ত কাহাকেও মানায় না—একেবারে ঠিক যেন বিলাতী সাহেব! বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার যো নাই!

বাসাখরচ যখন অচল হইয়া আসিল, যখন অনাথবন্ধু মনের ক্ষোভে স্থির করিলেন, অভিশপ্ত ভারতবর্ষে গুণের সমাদর নাই এবং তাঁহার স্বব্যবসায়িগণ ঈর্ষ্যাবশতঃ তাঁহার উন্নতিপথে গোপনে বাধা স্থাপন করিতেছে; যখন তাঁহার খানার ডিশে আমিষ অপেক্ষা উদ্ভিজ্জের পরিমাণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, দগ্ধ কুক্কুটের সম্মানকর স্থান ভর্জিত চিংড়ি একচেটে করিবার উপক্রম করিল, বেশভূষার চিক্কণতা এবং ক্ষৌরমসৃণ মুখের গর্ব্বোজ্জ্বল জ্যোতি ম্লান হইয়া আসিল—যখন সুতীব্র নিখাদে-বাঁধা জীবন-তন্ত্রী ক্রমশঃ সকরুণ কড়ি মধ্যমের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল, এমন সময় রাজকুমার বাবুর পরিবারে এক গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়া অনাথবন্ধুর সঙ্কটসঙ্কুল জীবনযাত্রায় পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। একদা গঙ্গাতীরবর্ত্তী মাতুলালয় হইতে নৌকাযোগে ফিরিবার সময় রাজকুমার বাবুর একমাত্র পুত্র হরকুমার ষ্টীমারের সংঘাতে স্ত্রী এবং বালক পুত্র সহ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনায় রাজকুমারের বংশে কন্যা বিন্ধ্যবাসিনী ব্যতীত আর কেহ রহিল না।

নিদারুণ শোকের কথঞ্চিৎ উপশম হইলে পর রাজকুমার বাবু অনাথবন্ধুকে গিয়া অনুনয় করিয়া কহিলেন,—"বাবা, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে হইবে। তোমরা ব্যতীত আমার আর কেহ নাই!"

অনাথবন্ধু উৎসাহসহকারে সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে সকল বার্-লাইব্রেরী-বিহারী স্বদেশীয় বারিষ্টরগণ তাঁহাকে ঈর্ষ্যা করে এবং তাঁহার অসামান্য ধী-শক্তির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রকাশ করে না এই উপায়ে তাহাদের প্রতি প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

রাজকুমার বাবু পণ্ডিতদিগের বিধান লইলেন। তাঁহারা বলিলেন অনাথবন্ধু যদি গোমাংস না খাইয়া থাকে তবে তাহাকে জাতে তুলিবার উপায় আছে।

বিদেশে যদিচ উক্ত নিষিদ্ধ চতুষ্পদ তাঁহার প্রিয় খাদ্য-শ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইত, তথাপি তাহা অস্বীকার করিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। প্রিয় বন্ধুদের নিকট কহিলেন—সমাজ যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা শুনিতে চাহে তখন একটা মুখের কথায় তাহাকে বাধিত করিতে দোষ দেখি না। যে রসনা গোরু খাইয়াছে, সে রসনাকে গোময় এবং মিথ্যা কথা নামক দুটো কদর্য্য পদার্থ দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া আমাদের আধুনিক সমাজের নিয়ম; আমি সে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে চাহি না।

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিবার একটা শুভদিন নির্দ্দিষ্ট

হইল। ইতিমধ্যে অনাথবন্ধু কেবল যে ধুতি চাদর পরিলেন তাহা নহে, তর্ক এবং উপদেশের দ্বারা বিলাতী সমাজের গালে কালি এবং হিন্দু সমাজের গালে চূণ লেপন করিতে লাগিলেন। যে শুনিল সকলেই খুসী হইয়া উঠিল।

আনন্দে, গর্ব্বে বিন্ধ্যবাসিনীর প্রীতিসুধাসিক্ত কোমল হৃদয়টি সর্ব্বত্র উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সে মনে মনে কহিল, বিলাত হইতে যিনিই আসেন, একেবারে আস্ত বিলাতী সাহেব হইয়া আসেন, দেখিয়া বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার যো থাকে না, কিন্তু আমার স্বামী একেবারে অবিকৃত ভাবে ফিরিয়াছেন বরঞ্চ তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে ভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে।

যথানির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে রাজকুমার বাবুর ঘর ভরিয়া গেল। অর্থব্যয়ের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। আহার এবং বিদায়ের আয়োজন যথোচিত হইয়াছিল।

অন্তঃপুরেও সমারোহের সীমা ছিল না। নিমন্ত্রিত পরিজন-বর্গের পরিবেশন ও পরিচর্য্যায় সমস্ত প্রকোষ্ঠ ও প্রাঙ্গণ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ঘোরতর কোলাহল এবং কর্ম্মরাশির মধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী প্রফুল্ল মুখে শারদরৌদ্ররঞ্জিত প্রভাতবায়ু-বাহিত লঘু মেঘখণ্ডের মত আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আজিকার দিনের সমস্ত বিশ্বব্যাপারের প্রধান নায়ক তাহার স্বামী। আজ যেন সমস্ত বঙ্গভূমি একটি মাত্র রঙ্গভূমি হই-য়াছে এবং যবনিকা উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক একমাত্র অনাথবন্ধুকে

বিস্মিত বিশ্ব দর্শকের নিকট প্রদর্শন করাইতেছে। প্রায়শ্চিত্ত যে অপরাধস্বীকার তাহা নহে, এ যেন অনুগ্রহপ্রকাশ। অনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া হিন্দু-সমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। এবং সেই গৌরব-চ্ছটা সমস্ত দেশ হইতে সহস্র রশ্মিতে বিচ্ছুরিত হইয়া বিন্ধ্য-বাসিনীর প্রেমপ্রমুদিত মুখের উপরে অপরূপ মহিমাজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। এতদিনকার তুচ্ছ জীবনের সমস্ত দুঃখ এবং ক্ষুদ্র অপমান দূর হইয়া সে আজ তাহার পরিপূর্ণ পিতৃ-গৃহে সমস্ত আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে উন্নত মস্তকে গৌরবের আসনে আরোহণ করিল। স্বামীর মহত্ত্ব আজ অযোগ্য স্ত্রীকে বিশ্বসংসারের নিকট সম্মানাস্পদ করিয়া তুলিল।

অনুষ্ঠান সমাধা হইয়াছে। অনাথবন্ধু জাতে উঠিয়াছেন। অভ্যাগত আত্মীয় ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার শেষ করিয়াছেন।

আত্মীয়েরা জামাতাকে দেখিবার জন্য অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাতা সুস্থচিত্তে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে প্রসন্নহাস্যমুখে আলস্যমন্থরগমনে ভূমিলুণ্ঠ্যমান চাদরে অন্তঃ-পুরে যাত্রা করিলেন।

আহারান্তে ব্রাহ্মণগণের দক্ষিণার আয়োজন হইতেছে এবং ইত্যবসরে তাঁহারা সভাস্থলে বসিয়া তুমুল কলহসহকারে পাণ্ডিত্য বিস্তার করিতেছেন। কর্ত্তা রাজকুমার বাবু ক্ষণকাল বিশ্রামউপলক্ষে সেই কোলাহলাকুল পণ্ডিতসভায় বসিয়া

স্মৃতির তর্ক শুনিতেছেন এমন সময় দ্বারবান গৃহস্বামীর হস্তে এক কার্ড দিয়া খবর দিল, "এক সাহেবলোগ্‌কা মেম আয়া।"

রাজকুমার বাবু চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই কার্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে ইংরাজিতে লেখা রহিয়াছে—মিসেস্ অনাথবন্ধু সরকার। অর্থাৎ অনাথবন্ধু সরকারের স্ত্রী।

রাজকুমার বাবু অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই এই সামান্য একটি শব্দের অর্থগ্রহ করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে বিলাত হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগতা, আরক্তকপোলা, আতাম্রকুন্তলা, আনীললোচনা, দুগ্ধফেনশুভ্রা, হরিণলঘুগামিনী ইংরাজমহিলা স্বয়ং সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিচিত প্রিয়মুখ দেখিতে পাইলেন না। অকস্মাৎ মেমকে দেখিয়া সংহিতার সমস্ত তর্ক থামিয়া সভাস্থল শ্মশানের ন্যায় গভীর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

এমন সময়ে ভূমিলুণ্ঠ্যমান চাদর লইয়া অলসমন্থরগামী অনাথবন্ধু রঙ্গভূমিতে আসিয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন। এবং মুহূর্ত্তের মধ্যেই ইংরাজ মহিলা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাঁহার তাম্বূলরাগরক্ত ওষ্ঠাধরে দাম্পত্যের মিলন-চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

সে দিন সভাস্থলে সংহিতার তর্ক আর উত্থাপিত হইতে পারিল না।

বিচারক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গতযৌবনা ক্ষীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেও যখন তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন অন্নমুষ্টির জন্ত দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্কার বোধ হইল।

যৌবনের শেষে শুভ্র শরৎকালের ন্যায় একটি গভীর প্রশান্ত প্রগাঢ় সুন্দর বয়স আসে যখন জীবনের ফল ফলিবার এবং শস্য পাকিবার সময়। তখন আর উদ্দাম যৌবনের বসন্তচঞ্চলতা শোভা পায় না। ততদিনে সংসারের মাঝখানে আমাদের ঘরবাঁধা এক প্রকার সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে; অনেক ভাল মন্দ অনেক সুখ দুঃখ জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া অন্তরের মানুষটিকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে; আমাদের আয়ত্তের অতীত কুহকিনী দুরাশার কল্পনালোক হইতে সমস্ত উদ্‌ভ্রান্ত বাসনাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতার গৃহপ্রাচীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; তখন নূতন প্রণয়ের মুগ্ধদৃষ্টি আর আকর্ষণ করা যায় না, কিন্তু পুরাতন

লোকের কাছে মানুষ আরও প্রিয়তর হইয়া উঠে। তখন যৌবন-লাবণ্য অল্পে অল্পে বিশীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে, কিন্তু জরাবিহীন অন্তরপ্রকৃতি বহুকালের সহবাসক্রমে মুখে চক্ষে যেন স্ফুটতর রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়; হাসিটি দৃষ্টিপাতটি কণ্ঠস্বরটি ভিতরকার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে। যাহা কিছু পাই নাই তাহার আশা ছাড়িয়া, যাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমাপ্ত করিয়া, যাহারা বঞ্চনা করিয়াছে, তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া, যাহারা কাছে আসিয়াছে ভালবাসিয়াছে, সংসারের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা শোক-তাপ-বিচ্ছেদের মধ্যে যে কয়টি প্রাণী নিকটে অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাদিগকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সুনিশ্চিত, সুপরীক্ষিত চিরপরিচিতগণের প্রীতিপরিবেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া তাহারই মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। যৌবনের সেই স্নিগ্ধ সায়াহ্নে জীবনের সেই শান্তিপর্ব্বেও যাহাকে নূতন সঞ্চয়, নূতন পরিচয়, নূতন বন্ধনের বৃথা আশ্বাসে নূতন চেষ্টায় ধাবিত হইতে হয়, তখনও, যাহার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচিত হয় নাই, যাহার গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হয় নাই সংসারে তাহার মত শোচনীয় আর কেহ নাই।

ক্ষীরোদা তাহার যৌবনের প্রান্তসীমায় যে দিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্ব্বরাত্রে তাহার সমস্ত অলঙ্কার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে,—

বাড়ীভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই, তিন বৎসরের শিশু পুত্রটিকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সঙ্গতি নাই,—যখন সে ভাবিয়া দেখিল তাহার জীবনের আটত্রিশ বৎসরে সে একটি লোককেও আপনার করিতে পারে নাই, একটি ঘরের প্রান্তেও বাঁচিবার এবং মরিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই ;—যখন তাহার মনে পড়িল আবার আজ অশ্রুজল মুছিয়া দুই চক্ষে অঞ্জন পরিতে হইবে, অধরে ও কপোলে অলক্তরাগ চিত্রিত করিতে হইবে, জীর্ণ যৌবনকে বিচিত্র ছলনায় আচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে অসীম ধৈর্য্য সহকারে নূতন হৃদয় হরণের জন্য নূতন মায়াপাশ বিস্তার করিতে হইবে,—তখন সে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বারম্বার কঠিন মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল,—সমস্ত দিন অনাহারে মুমূর্ষুর মত পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল; দীপহীন গৃহকোণে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। দৈবক্রমে একজন পুরাতন প্রণয়ী আসিয়া "ক্ষীরো" "ক্ষীরো" শব্দে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। ক্ষীরোদা অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া ঝাঁটাহস্তে বাঘিনীর মত গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল,—রসপিপাসু যুবকটি অনতিবিলম্বে পলায়নের পথ অবলম্বন করিল।

ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাটের নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সেই গোলেমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ভগ্নকাতর কণ্ঠে মা মা করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন ক্ষীরোদা সেই রুগ্নমান শিশুকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া নিকটবর্ত্তী কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শব্দ শুনিয়া আলো হস্তে প্রতিবেশিগণ কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদা এবং শিশুকে তুলিতে বিলম্ব হইল না। ক্ষীরোদা তখন অচেতন এবং শিশুটি মরিয়া গেছে।

হাঁসপাতালে গিয়া ক্ষীরোদা আরোগ্য লাভ করিল। হত্যাপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাহাকে সেশনে চালান করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জজ মোহিতমোহন দত্ত। ষ্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান্। তাঁহার কঠিন বিচারে ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম হইল। হতভাগিনীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উকীলগণ তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। জজ তাহাকে তিলমাত্র দয়ার পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

না পারিবার কারণ আছে। একদিকে তিনি হিন্দুমহিলা-গণকে দেবী আখ্যা দিয়া থাকেন, অপরদিকে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অবিশ্বাস। তাঁহার মত এই যে,

রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্জরে একটি কুল-নারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।

তাঁহার এরূপ বিশ্বাসের কারণও আছে। সে কারণ জানিতে গেলে মোহিতের যৌবন-ইতিহাসের কিয়দংশ আলোচনা করিতে হয়।

মোহিত যখন কালেজে সেকেণ্ড্-ইয়ারে পড়িতেন তখন আকারে এবং আচারে এখনকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের মানুষ ছিলেন। এখন মোহিতের সম্মুখে টাক, পশ্চাতে টিকি; মুণ্ডিত মুখে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খরক্ষুর-ধারে গুম্ফশ্মশ্রুর অঙ্কুর উচ্ছেদ হইয়া থাকে; কিন্তু তখন তিনি সোণার চশ্‌মায়, গোঁফদাড়িতে এবং সাহেবীধরণের কেশবিন্যাসে উনবিংশ শতাব্দীর নূতন সংস্করণ কার্ত্তিকটির মত ছিলেন। বেশ্‌ভূষায় বিশেষ মনোযোগ ছিল, মদ্য মাংসে অরুচি ছিল না এবং আনুষঙ্গিক আরও দুটো একটা উপসর্গ ছিল।

অদূরে এক ঘর গৃহস্থ বাস করিত। তাহাদের হেমশশি বলিয়া এক বিধবা কন্যা ছিল। তাহার বয়স অধিক হইবে না। চোদ্দ হইতে পনরয় পড়িবে।

সমুদ্র হইতে বনশ্যামাঙ্গিনীলা তটভূমি যেমন রমণীয় স্বপ্নবৎ চিত্রবৎ মনে হয় এমন তীরের উপরে উঠিয়া হয় না। বৈধব্যের বেষ্টন-অন্তরালে হেমশশি সংসার হইতে যেটুকু দূরে পড়িয়াছিল

সেই দূরত্বের বিচ্ছেদবশতঃ সংসারটা তাহার কাছে পরপারবর্ত্তী পরমরহস্যময় প্রমোদবনের মত ঠেকিত। সে জানিত না এই জগৎযন্ত্রটার কলকারখানা অত্যন্ত জটিল এবং লৌহকঠিন,—সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে, সংশয়ে সঙ্কটে ও নৈরাশ্যে পরিতাপে বিমিশ্রিত। তাহার মনে হইত সংসারযাত্রা কলনাদিনী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ জলপ্রবাহের মত সহজ, সম্মুখবর্ত্তী সুন্দর পৃথিবীর সকল পথগুলিই প্রশস্ত ও সরল, সুখ কেবল তাহার বাতায়নের বাহিরে এবং তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা কেবল তাহার বক্ষঃপঞ্জরবর্ত্তী স্পন্দিত পরিতপ্ত কোমল হৃদয়টুকুর অভ্যন্তরে। বিশেষতঃ তখন তাহার অন্তরাকাশের দূর দিগন্ত হইতে একটা যৌবন-সমীরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশ্বসংসারকে বিচিত্র বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল; সমস্ত নীলাম্বর তাহারই হৃদয়হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবী যেন তাহারই সুগন্ধ মর্ম্মকোষের চতুর্দ্দিকে রক্তপদ্মের কোমল পাপ্‌ড়িগুলির মত স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া ছিল।

ঘরে তাহার বাপ মা এবং দুটি ছোট ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না। ভাই দুটি সকাল সকাল খাইয়া ইস্কুলে যাইত, আবার ইস্কুল হইতে আসিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার পর পাড়ার নাইট্‌-স্কুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত। বাপ সামান্য বেতন পাইতেন, ঘরে মাষ্টার রাখিবার সামর্থ্য ছিল না।

কাজের অবসরে হেম তাহার নির্জ্জন ঘরের বাতায়নে আসিয়া বসিত। একদৃষ্টে রাজপথের লোক চলাচল দেখিত;

ফেরিওয়ালা করুণ উচ্চস্বরে হাঁকিয়া যাইত তাহাই শুনিত; এবং মনে করিত পথিকেরা সুখী, ভিক্ষুকেরাও স্বাধীন, এবং ফেরিওয়ালারা, যে, জীবিকার জন্য সুকঠিন প্রয়াসে প্রবৃত্ত তাহা নহে, উহারা যেন এই লোকচলাচলের সুখরঙ্গভূমিতে অন্যতম অভিনেতামাত্র।

আর সকালে বিকালে সন্ধ্যাবেলায় পরিপাটীবেশধারী গর্ব্বোদ্ধত স্ফীতবক্ষ মোহিতমোহনকে দেখিতে পাইত। দেখিয়া তাহাকে সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রের মত মনে হইত। মনে হইত, ঐ উন্নতমস্তক সুবেশ সুন্দর যুবকটির সব আছে এবং উহাকে সব দেওয়া যাইতে পারে। বালিকা যেমন পুতুলকে সজীব মানুষ করিয়া খেলা করে, বিধবা তেমনি মোহিতকে মনে মনে সকল প্রকার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তাহাকে দেবতা গড়িয়া খেলা করিত।

এক একদিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে পাইত মোহিতের ঘর আলোকে উজ্জ্বল, নর্ত্তকীর নূপুরনিক্বণ এবং বামাকণ্ঠের সঙ্গীত-ধ্বনিতে মুখরিত। সেদিন সে ভিত্তিস্থিত চঞ্চল ছায়াগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনিদ্র সতৃষ্ণ নেত্রে দীর্ঘরাত্রি জাগিয়া বসিয়া কাটাইত। তাহার ব্যথিত পীড়িত হৃৎপিণ্ড, পিঞ্জরের পক্ষীর মত, বক্ষঃপঞ্জরের উপর দুর্দ্দান্ত আবেগে আঘাত করিতে থাকিত।

সে কি তাহার কৃত্রিম দেবতাটিকে বিলাসমত্ততার জন্য মনে মনে ভর্ৎসনা করিত, নিন্দা করিত? তাহা নহে। অগ্নি

যেমন পতঙ্গকে নক্ষত্রলোকের প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, মোহিতের সেই আলোকিত গীতবাদ্যবিক্ষুব্ধ, প্রমোদ-মদিরোচ্ছ্বসিত কক্ষটি হেমশশিকে সেইরূপ স্বর্গমরীচিকা দেখাইয়া আকর্ষণ করিত। সে গভীর রাত্রে একাকিনী জাগিয়া বসিয়া সেই অদূর বাতায়নের আলোক ও ছায়া ও সঙ্গীত এবং আপন মনের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা লইয়া একটি মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিত, এবং আপন মানসপুত্তলিকাকে সেই মায়াপুরীর মাঝখানে বসাইয়া বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিত এবং আপন জীবন যৌবন সুখ দুঃখ ইহকাল পরকাল সমস্তই বাসনার অঙ্গারে ধূপের মত পুড়াইয়া সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ মন্দিরে তাহার পূজা করিত। সে জানিত না তাহার সম্মুখবর্ত্তী ঐ হর্ম্ম্যবাতায়নের অভ্যন্তরে ঐ তরঙ্গিত প্রমোদপ্রবাহের মধ্যে এক নিরতিশয় ক্লান্তি, গ্লানি, পঙ্কিলতা, বীভৎস ক্ষুধা এবং প্রাণক্ষয়কর দাহ আছে। ঐ বীতনিদ্র নিশাচর আলোকের মধ্যে যে এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কুটিলহাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে বিধবা দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইত না।

হেম আপন নির্জ্জন বাতায়নে বসিয়া তাহার এই মায়াস্বর্গ এবং কল্পিত দেবতাটিকে লইয়া চিরজীবন স্বপ্নাবেশে কাটাইয়া দিতে পারিত কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেবতা অনুগ্রহ করিলেন এবং স্বর্গ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। স্বর্গ যখন একেবারে পৃথিবীকে আসিয়া স্পর্শ করিল তখন স্বর্গও ভাঙ্গিয়া গেল এবং যে ব্যক্তি

এতদিন একলা বসিয়া স্বর্গ গড়িয়াছিল সেও ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হইল।

এই বাতায়নবাসিনী মুগ্ধ বালিকাটির প্রতি কখন্ মোহিতের লালায়িত দৃষ্টি পড়িল, কখন্ তাহাকে"বিনোদচন্দ্র"নামক মিথ্যাস্বাক্ষরে বারম্বার পত্র লিখিয়া অবশেষে একখানি সশঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত, অশুদ্ধ বানান ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগপূর্ণ উত্তর পাইল—এবং তাহার পর কিছুদিন ঘাতপ্রতিঘাতে, উল্লাসে সঙ্কোচে, সন্দেহে সম্ভ্রমে, আশায় আশঙ্কায় কেমন করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল,—তাহার পরে প্রলয়সুখোন্মত্ততায় সমস্ত জগৎ সংসার বিধবার চারিদিকে কেমন করিয়া ঘুরিতে লাগিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ঘূর্ণনবেগে সমস্ত জগৎ অমূলক ছায়ার মত কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল,—এবং অবশেষে কখন্ এক-দিন অকস্মাৎ সেই ঘূর্ণ্যমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া রমণী অতি দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, সে সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিবার আবশ্যক দেখি না।

একদিন গভীর রাত্রে পিতা মাতা ভ্রাতা এবং গৃহ ছাড়িয়া হেমশশি "বিনোদচন্দ্র" ছদ্মনামধারী মোহিতের সহিত এক গাড়িতে উঠিয়া বসিল। দেবপ্রতিমা যখন তাহার সমস্ত মাটি এবং খড় এবং রাংতার গহনা লইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইল, তখন সে লজ্জায় এবং ধিক্কারে মাটিতে মিশাইয়া গেল।

অবশেষে গাড়ি যখন ছাড়িয়া দিল, তখন সে কাঁদিয়া

মোহিতের পায়ে ধরিল, বলিল, "ওগো, পায়ে পড়ি আমাকে আমার বাড়ি রেখে এস!" মোহিত শশব্যস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—গাড়ি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

জলনিমগ্ন মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী স্পষ্ট মনে পড়ে তেমনি সেই দ্বাররুদ্ধ গাড়ির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হেমশশির মনে পড়িতে লাগিল, প্রতিদিন আহারের সময় তাহার বাপ তাহাকে সম্মুখে না লইয়া খাইতে বসিতেন না;—মনে পড়িল তাহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভাইটি ইস্কুল হইতে আসিয়া তাহার দিদির হাতে খাইতে ভালবাসে; মনে পড়িল, সকালে সে তাহার মায়ের সহিত পান সাজিতে বসিত এবং বিকালে মা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেন। ঘরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কোণ এবং দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজটি তাহার মনের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার নিভৃত জীবন এবং ক্ষুদ্র সংসারটিকেই স্বর্গ বলিয়া মনে হইল। সেই পানসাজা, চুলবাঁধা, পিতার আহারস্থলে পাখা করা, ছুটির দিনে মধ্যাহ্ননিদ্রার সময় তাঁহার পাকাচুল তুলিয়া দেওয়া, ভাইদের দৌরাত্ম্য সহ্য করা,—এ সমস্তই তাহার কাছে পরম-শান্তিপূর্ণ দুর্লভ সুখের মত বোধ হইতে লাগিল,—বুঝিতে পারিল না এ সব থাকিতে সংসারে আর কোন্ সুখের আবশ্যক আছে!

মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীতে ঘরে ঘরে সমস্ত কুলকন্যারা এখন গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। সেই আপনার ঘরে আপনার

শয্যাটির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রের নিশ্চিন্ত নিদ্রা যে কত সুখের তাহা ইতিপূর্ব্বে কেন সে বুঝিতে পারে নাই! ঘরের মেয়েরা কাল সকালবেলায় ঘরের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, নিঃসঙ্কোচে নিত্যকর্ম্মের মধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, আর গৃহচ্যুতা হেমশশির এই নিদ্রাহীন রাত্রি কোন্‌খানে গিয়া প্রভাত হইবে, এবং সেই নিরানন্দ প্রভাতে তাহাদের সেই গলির ধারের ছোটখাট ঘরকন্নাটির উপর যখন সকালবেলাকার চিরপরিচিত শান্তিময় হাস্যপূর্ণ রৌদ্রটি আসিয়া পতিত হইবে তখন সেখানে সহসা কি লজ্জা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, কি লাঞ্ছনা কি হাহাকার জাগ্রত হইয়া উঠিবে!

হেম হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া মরিতে লাগিল;—সকরুণ অনুনয়সহকারে বলিতে লাগিল, "এখনো রাত আছে; আমার মা, আমার দুটি ভাই এখনো জাগে নাই, এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস!" কিন্তু তাহার দেবতা কর্ণপাত করিল না; এক দ্বিতীয় শ্রেণীর চক্রশব্দমুখরিত রথে চড়াইয়া তাহাকে তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোকাভিমুখে লইয়া চলিল।

ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা এবং স্বর্গ পুনশ্চ আর একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জীর্ণরথে চড়িয়া আর এক পথে প্রস্থান করিলেন,—রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মোহিতমোহনের পূর্ব্ব-ইতিহাস হইতে এই একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলাম। রচনা পাছে "একঘেয়ে" হইয়া উঠে এই জন্য অন্যগুলি বলিলাম না।

এখন সে সকল পুরাতন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকও নাই। এখন সেই বিনোদচন্দ্র নাম স্মরণ করিয়া রাখে এমন কোন লোক জগতে আছে কি না সন্দেহ। এখন মোহিত শুদ্ধাচারী হইয়াছেন, তিনি আহ্নিক তর্পণ করেন এবং সর্ব্বদাই শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। নিজের ছোট ছোট ছেলে-দিগকেও যোগাভ্যাস করাইতেছেন এবং বাড়ির মেয়েদিগকে সূর্য্য চন্দ্র মরুদ্গণের দুষ্প্রবেশ্য অন্তঃপুরে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু এককালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া আজ রমণীর সর্ব্বপ্রকার সামা-জিক অপরাধের কঠিনতম দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।

ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দেওয়ার দুই এক দিন পরে ভোজনবিলাসী মোহিত জেলখানার বাগান হইতে মনোমত তরীতরকারী সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। ক্ষীরোদা তাহার পতিত জীবনের সমস্ত অপরাধ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল। বন্দিনীশালায় প্রবেশ করিলেন।

দূর হইতে খুব একটা কলহের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন ক্ষীরোদা প্রহরীর সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়াছে। মোহিত মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবই এমনি বটে! মৃত্যু সন্নিকট তবু ঝগড়া করিতে ছাড়িবে না। ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদূতের সহিত কোন্দল করে।

মোহিত ভাবিলেন, যথোচিত ভর্ৎসনা ও উপদেশের দ্বারা এখন ইহার অন্তরে অনুতাপের উদ্রেক করা উচিত। সেই সাধু উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষীরোদার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র ক্ষীরোদা সকরুণস্বরে করযোড়ে কহিল—ওগো জজ্ বাবু, দোহাই তোমার! উহাকে বল আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়!

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, ক্ষীরোদার মাথার চুলের মধ্যে একটি আংটি লুকানো ছিল—দৈবাৎ প্রহরীর চোখে পড়াতে সে সেটি কাড়িয়া লইয়াছে।

মোহিত আবার মনে মনে হাসিলেন। আজ বাদে কাল ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিবে তবু আংটীর মায়া ছাড়িতে পারে না! গহনাই মেয়েদের সর্ব্বস্ব!

প্রহরীকে কহিলেন—কই, আংটী দেখি। প্রহরী তাঁহার হাতে আংটী দিল।

তিনি হটাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন এমনি চমকিয়া উঠিলেন। আংটীর একদিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র

ছবি বসানো আছে, এবং অপর দিকে সোনার গায়ে খোদা রহিয়াছে—বিনোদচন্দ্র।

তখন মোহিত আংটী হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার আর একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

মোহিত আর একবার সোনার আংটীর দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

নিশীথে।

"ডাক্তার! ডাক্তার!"

জ্বালাতন করিল! এই অর্দ্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবু। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙ্গা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণ বাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে,—তোমার ঔষধ কোন কাজে লাগিল না।

আমি কিঞ্চিৎ সসঙ্কোচে বলিলাম, আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।

দক্ষিণা বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—ওটা তোমার ভারি ভ্রম। মদ নহে;—আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।

কুলুঙ্গির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন্ জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের কাগজ-পাতা প্যাক্ বাক্সের উপর বসিলাম। দক্ষিণা বাবু বলিতে লাগিলেন।—

আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মত এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশী ছিল না; সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপনায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত,—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোন উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড় বড় কাব্যের টুক্‌রা এবং ভাল ভাল আদরের সম্ভাষণ মুহূর্ত্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠব্রণ হইয়া জরবিকার হইয়া মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে, ডাক্তারে জবাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল;—সে গব্যঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাঁটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া

দিল। ঔষধের গুণেই হউক বা অদৃষ্টক্রমেই হউক সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই ক'টা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মত দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর কোন কিছুর প্রতিই দৃষ্টি ছিল না।

যম তখন পরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাইবার সময় আমার স্ত্রীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানাপ্রকার জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন—আঃ, কর কি! লোকে বলিবে কি! অমন করিয়া দিন রাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না!

যেন নিজে পাখা খাইতেছি এইরূপ ভাণ করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতাম'ত

ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত; কোন দিন যদি তাঁহার শুশ্রূষা উপলক্ষে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত তবে সেও নানাপ্রকার অনুনয় অনুরোধ অনুযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, পুরুষ মানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ীর সাম্‌নেই বাগান, এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মত একটুক্‌রা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশী। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না—এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্ম্মিত লাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ, করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাচুর্ভাব কিছু বেশী। প্রকাণ্ড একটা বকুল গাছের তলা সাদা মার্ব্বল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত কিন্তু

গঙ্গা হইতে কুঠির পান্সীর বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, ঘরে বদ্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।

আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুল-তলের প্রস্তর-বেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানুর উপরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম কিন্তু জানি সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন। তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত-জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারিদিক শান্ত নিস্তব্ধ; সেই ঘনগন্ধ-পূর্ণ ছায়ান্ধকারে একপার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার একটি উত্তপ্ত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আমি বলিয়া উঠিলাম—তোমার ভালবাসা আমি কোন কালে ভুলিব না!

তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোন আবশ্যক ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল—এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদ-স্বরূপে একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, কোন কালে ভুলিবে না, ইহা কখনও সম্ভব নহে, এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।

ঐ সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়েই আমি কখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে রীতিমত প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে সকল কথা মনে উদয় হইত, তাঁহার সম্মুখে গেলেই সে গুলাকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে সব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

বাদ প্রতিবাদ কথায় চলে, কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এমন জ্যোৎস্না রাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে?

বহু চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর রোগ উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার বলিল, একবার বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিলে ভাল হয়। আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন্ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্‌ভন্ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সেখানে হারাণ ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেক কাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং আমার স্ত্রীও বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্যামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিররুগ্ন হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন, একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন,—যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই, তখন আর কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে? তুমি আর একটা বিবাহ কর।

এটা যেন কেবল একটা সুযুক্তি এবং সদ্বিবেচনার কথা—ইহার মধ্যে যে, ভারি একটা মহত্ত্ব বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে? আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিলাম—যতদিন এই দেহে জীবন আছে—

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন—নাও! নাও! আর বলিতে হইবে না! তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না!

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম—এ জীবনে আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারিব না!

শুনিয়া আমার স্ত্রী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানি না, তখন নিজের কাছেও কখনও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি এই আরোগ্য-আশাহীন সেবাকার্য্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্য্যে যে ভঙ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না; অথচ চিরজীবন এই চিররুগ্নকে লইয়া যাপন করিতে হইবে এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়! প্রথম যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, সুখের আশ্বাসে, সৌন্দর্য্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলই আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন! তখন জানিতাম না কিন্তু এখন

সন্দেহমাত্র নাই যে, তিনি আমাকে যুক্তঅক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মত অতি সহজে বুঝিতেন। সেই জন্য, যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন সুগভীর স্নেহ অথচ অনিবার্য্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন, এ কথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারাণ ডাক্তার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত—তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার বলেন তিনি মনের মত পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম, মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু আর কোন দোষ ছিল না। যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা। সেই জন্য মাঝে মাঝে এক এক দিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন, আমি হারাণ ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছি, কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্য্যন্ত, তখন চোখের সামনে কূল-পরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। এখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারাণ ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভাল। কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় নাই। কিন্তু মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসাড় যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী হারাণ বাবুকে বলিতেছেন,—ডাক্তার, কতকগুলা মিথ্যা ওষুধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন? আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ওষুধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।

ডাক্তার বলিলেন, ছি, এমন কথা বলিবেন না।

কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড় আঘাত লাগিল।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়া তাঁহার শয্যা-প্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, এ ঘর বড় গরম—তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাত্রে তোমার ক্ষুধা হইবে না।

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্ব্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্ব্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণা বাবু অনেকক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, আমাকে একগ্লাস জল আনিয়া দাও। জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন;—

একদিন ডাক্তার বাবুর কন্যা মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কি কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব আমার ভাল লাগিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কোন হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যা বেলায় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সে দিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্যদিনের অপেক্ষা কিছু

বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সে দিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন; কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে তাহাতেই তাঁহার যন্ত্রণা বুঝা যায়। ঘরে কোন সাড়া ছিল না, আমি শয্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম;—সে দিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন, এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, কিম্বা হয় ত বড় কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল। ঘর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক একবার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশমে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা যাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক্ হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরে কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ও কে?—তাঁহার সেই দুর্ব্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই তিন বার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, ও কে? ও কে গো?

আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, আমি চিনি না! বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশা-

ঘাত করিল। পরের মুহূর্ত্তেই বলিলাম—ওঃ, আমাদের ডাক্তার বাবুর কন্যা!

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন;—আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, আপনি আসুন।—আমাকে বলিলেন, আলোটা ধর!

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিণীর অল্পস্বল্প আলাপ চলিতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন—এই নীল শিশিটা মালিশ করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না; এ ওষুধটা ভারি বিষ।

আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দুটি শয্যাপার্শ্ববর্ত্তী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন—বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইহাকে সেবা করিবে কে?

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, না,না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরাণো ঝি আছে সে আমাকে মায়ের মত যত্ন করে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—উনি মা'লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন, ডাক্তার বাবু, ইনি বদ্ধঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইঁহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?

ডাক্তার বাবু আমাকে কহিলেন, আসুন না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।—

আমি ঈষৎ আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলম্বে সম্মত হইলাম। ডাক্তার বাবু যাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সে দিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি, আমার স্ত্রী ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার কি ব্যথা বাড়িয়াছে?—

তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম। ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেকক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ব্যথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে? ঔষধটা একবার মালিশ করিলে হয় না?

বলিয়া শিশিটা টেবিল হইতে লইয়া দেখিলেন সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন?—আমার স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন—হাঁ।

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প আনিতে ছুটিলেন। আমি অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের ন্যায় আমার স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে যেমন করিয়া সান্ত্বনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারম্বার করিয়া বলিতে লাগিলেন—শোক করিয়ো না, ভালই হইয়াছে—তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

—দক্ষিণাচরণ আর একবার জল খাইয়া বলিলেন, উঃ বড় গরম! বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন যাদু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল। কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোনখানে কি খট্‌কা লাগিয়া গিয়াছিল আমি কেমন করিয়া বুঝিব?

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছম্‌ছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখীদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুই ধারে ঘন ছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শুভ্র পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম।

সেখানে অন্ধকার আরও ঘনীভূত,—যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া

আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুরবর্ণে অঙ্কিত সেই শিথিলঅঞ্চল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্ত্তিটি আমার মনে এক অনিবার্য্য আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল;—শাদা পাথরের উপর শাদা সাড়িপরা সেই শ্রান্ত-শয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালবাসি তোমাকে আমি কোনকালে ভুলিতে পারিব না।

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল ঠিক এই কথাটা আর এক দিন আর কাহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মুহূর্ত্তেই বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙ্গা চাঁদের নীচে দিয়া গঙ্গার পূর্ব্ব পার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিম পার পর্য্যন্ত হাহা—হাহা—হাহা—করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল! সেটা মর্ম্মভেদী হাসি, কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তদ্দণ্ডেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম আমার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছি। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন?—আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, শুনিতে পাও নাই সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল?

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন—সে বুঝি হাসি? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ এক ঝাঁক পাখী উড়িয়া গেল তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি এত অল্পেই ভয় পাও?—

দিনের বেলায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখীর ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তর দেশ হইতে হংসশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত চারিদিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে করিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড় সুখে ছিলাম। চারিদিকের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার অনেক দিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া, খড়ে' ছড়াইয়া, অবশেষে পদ্মায় আসিয়া

পৌঁছিলাম। ভয়ঙ্করী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মত কৃশ নির্জ্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তর পারে জনশূন্য তৃণশূন্য চিহ্নশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে—এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আম্র-বাগানগুলি এই রাক্ষসীনদীর নিতান্ত মুখের কাছে যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে;—পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুই জনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূরে চলিয়া গেলাম। সূর্য্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শুক্ল-পক্ষের নির্ম্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অন্তহীন শুভ্র বালির চরের উপর যখন অজস্র অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল—তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রলোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে কেবল আমরা দুই জনে ভ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেষ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল; অত্যন্ত কাছে

আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীর মন, জীবন যৌবন আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত উদ্বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালবাসা যায়? এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষকে কোথাও ধরে? তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গম্যহীন পথে, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিতভাবে চলিয়া যাইব।

এইরূপে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম সেই বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মত হইয়াছে—পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেইখানে জল বাধিয়া আছে।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিসুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্চ্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুইজনে দাঁড়াইলাম—মনোরমা কি ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নাবিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

এমন সময় সেই জনমানবশূন্য নিঃশব্দ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীরস্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল—ও কে? ও কে? ও কে?

আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুইজনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে—চর-বিহারী জলচর পাখীর ডাক। হঠাৎ এতরাত্রে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোক-সমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুই জনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাত্রে বিছানায় আসিয়া শুইলাম; শ্রান্ত-শরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

তখন অন্ধকারে কে এক জন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটি মাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থি-সার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপি চুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—ও কে? ও কে? ও কে গো?—

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহূর্ত্তেই ছায়ামূর্ত্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্ম্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্ত্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষীণ-তর, ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে,—ক্রমে

যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল—ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল—এত ক্ষীণ শব্দ কখন শুনি নাই, কল্পনা করি নাই—আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাই-তেছে, কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না;—অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল, তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম, অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল—ও কে, ও কে, ও কে গো। আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল—ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো! সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেল্‌ফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো!

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাবু পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম একটু জল খান। এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ্‌দপ্ করিতে করিতে নিবিয়া গেল।

হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিশ্ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্ত্তী পথে একটা মহিষের গাড়ির কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্ শব্দ জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাবুর মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততায় আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সে জন্য যেন অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্টসম্ভাষণমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই দিনই অর্দ্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল—ডাক্তার! ডাক্তার!

আপদ।

সন্ধ্যার দিকে ঝড় ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল। বৃষ্টির ঝাপট, বজ্রের শব্দ, এবং বিদ্যুতের ঝিক্‌মিকিতে আকাশে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কালো কালো মেঘগুলো মহা-প্রলয়ের জয়পতাকার মত দিগ্বিদিকে উড়িতে আরম্ভ করিল, গঙ্গার এপারে ওপারে বিদ্রোহী ঢেউগুলো কলশব্দে নৃত্য জুড়িয়া দিল, এবং বাগানের বড় বড় গাছগুলো সমস্ত শাখা ঝট্‌পট্‌ করিয়া হা হুতাশ সহকারে দক্ষিণে বামে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

তখন চন্দননগরের বাগানবাড়িতে একটি দীপালোকিত রুদ্ধ কক্ষে খাটের সম্মুখবর্ত্তী নীচের বিছানায় বসিয়া স্ত্রীপুরুষে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।

শরৎ বাবু বলিতেছিলেন, আর কিছু দিন থাকিলেই তোমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিবে, তখন আমরা দেশে ফিরিতে পারিব।

কিরণময়ী বলিতেছিলেন, আমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছে, এখন দেশে ফিরিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, কথাটা যত সংক্ষেপে রিপোর্ট্‌ করিলাম তত সংক্ষেপে শেষ হয় নাই। বিষয়টি বিশেষ দুরূহ নয়, তথাপি বাদ প্রতিবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না; কর্ণহীন নৌকার

মত ক্রমাগতই ঘুর খাইয়া মরিতেছিল; অবশেষে অশ্রুতরঙ্গে ডুবি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

শরৎ কহিলেন, ডাক্তার বলিতেছে আর কিছুদিন থাকিয়া গেলে ভাল হয়।

কিরণ কহিলেন, তোমার ডাক্তার ত সব জানে!

শরৎ কহিলেন, জান ত, এই সময়ে দেশে নানাপ্রকার ব্যামোর প্রাদুর্ভাব হয়, অতএব আর মাস দুয়েক কাটাইয়া গেলেই ভাল হয়।

কিরণ কহিলেন, এখানে এখন বুঝি কোথাও কাহারো কোন ব্যামো হয় না!

পূর্ব্ব ইতিহাসটা এই। কিরণকে তাহার ঘরের এবং পাড়ার সকলেই ভালবাসে, এমন কি, শাশুড়ি পর্য্যন্ত। সেই কিরণের যখন কঠিন পীড়া হইল তখন সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিল— এবং ডাক্তার যখন বায়ুপরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিল, তখন গৃহ এবং কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে তাহার স্বামী এবং শাশুড়ি কোন আপত্তি করিলেন না। যদিও গ্রামের বিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই, বায়ুপরিবর্ত্তনে আরোগ্যের আশা করা এবং স্ত্রীর জন্ত এতটা হুলস্থূল করিয়া তোলা নব্য স্ত্রৈণতার একটা নির্লজ্জ আতিশয্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, ইতিপূর্ব্বে কি কাহারও স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয় নাই, শরৎ সেখানে যাওয়া স্থির করিয়াছেন সেখানে কি মানুষরা অমর, এবং এমন কোন দেশ আছে কি যেখানে অদৃষ্টের লিপি সফল

হয় না—তথাপি শরৎ এবং তাঁহার মা সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তখন গ্রামের সমস্ত সমবেত বিজ্ঞতার অপেক্ষা তাঁহাদের হৃদয়লক্ষ্মী কিরণের প্রাণটুকু তাঁহাদের নিকট গুরুতর বোধ হইল। প্রিয়ব্যক্তির বিপদে মানুষের এরূপ মোহ ঘটিয়া থাকে।

শরৎ চন্দননগরের বাগানে আসিয়া বাস করিতেছেন, এবং কিরণও রোগমুক্ত হইয়াছেন, কেবল শরীর এখনও সম্পূর্ণ সবল হয় নাই। তাঁহার মুখে চক্ষে একটি সকরুণ কৃশতা অঙ্কিত হইয়া আছে, যাহা দেখিলে হৃৎকম্প সহ মনে উদয় হয়, আহা, বড় রক্ষা পাইয়াছে!

কিন্তু কিরণের স্বভাবটা সঙ্গপ্রিয়, আমোদপ্রিয়। এখানে একলা আর ভাল লাগিতেছে না; তাহার ঘরের কাজ নাই, পাড়ার সঙ্গিনী নাই, কেবল সমস্ত দিন আপনার রুগ্ন শরীরটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে মন যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাগ মাপিয়া ঔষধ খাও, তাপ দাও, পথ্য পালন কর, ইহাতে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে; আজ ঝড়ের সন্ধ্যাবেলায় রুদ্ধগৃহে স্বামী স্ত্রীতে তাহাই লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

কিরণ যতক্ষণ উত্তর দিতেছিল ততক্ষণ উভয় পক্ষে সমকক্ষভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল, কিন্তু অবশেষে কিরণ যখন নিরুত্তর হইয়া বিনা প্রতিবাদে শরতের দিক হইতে ঈষৎ বিমুখ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল, তখন দুর্ব্বল নিরুপায় পুরুষটির আর কোন অস্ত্র রহিল না। পরাভব স্বীকার করি-

বার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় বাহির হইতে বেহারা উচ্চৈঃস্বরে কি একটা নিবেদন করিল।

শরৎ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া শুনিলেন, নৌকা ডুবি হইয়া একটি ব্রাহ্মণ বালক সাঁতার দিয়া তাঁহাদের বাগানে আসিয়া উঠিয়াছে।

শুনিয়া কিরণের মান অভিমান দূর হইয়া গেল, তৎ-ক্ষণাৎ আলনা হইতে শুষ্কবস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন, এবং শীঘ্র এক বাটি দুধ গরম করিয়া ব্রাহ্মণের ছেলেকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ছেলেটির লম্বা চুল, বড় বড় চোখ, গোঁফের রেখা এখনো উঠে নাই। কিরণ তাহাকে নিজে থাকিয়া ভোজন করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

শুনিলেন, সে যাত্রার দলের ছোক্‌রা; তাহার নাম নীলকান্ত। তাহারা নিকটবর্ত্তী সিংহ বাবুদের বাড়ি যাত্রার জন্য আহূত হইয়াছিল; ইতিমধ্যে নৌকা ডুবি হইয়া তাহাদের দলের লোকের কি গতি হইল কে জানে; সে ভাল সাঁতার জানিত, কোন মতে প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

ছেলেটি এইখানেই রহিয়া গেল। আর একটু হইলেই সে মারা পড়িত এই মনে করিয়া তাহার প্রতি কিরণের অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল।

শরৎ মনে করিলেন, হইল ভাল, কিরণ একটা নূতন কাজ হাতে পাইলেন, এখন কিছুকাল এইভাবেই কাটিয়া যাইবে।

ব্রাহ্মণ বালকের কল্যাণে পুণ্যসঞ্চয়ের প্রত্যাশায় শাশুড়িও প্রসন্নতা লাভ করিলেন। এবং অধিকারী মহাশয় ও যমরাজের হাত হইতে সহসা এই ধনী পরিবারের হাতে বদ্‌লি হইয়া নীলকান্ত বিশেষ আরাম বোধ করিল।

কিন্তু অনতিবিলম্বে শরৎ এবং তাঁহার মাতার মত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন আর আবশ্যক নাই, এখন এই ছেলেটাকে বিদায় করিতে পারিলে আপদ যায়।

নীলকান্ত গোপনে শরতের গুড়্‌গুড়িতে ফড়্‌ ফড়্‌ শব্দে তামাক টানিতে আরম্ভ করিল। বৃষ্টির দিনে অম্লানবদনে তাঁহার সখের সিল্কের ছাতাটি মাথায় দিয়া নববন্ধুসঞ্চয়চেষ্টায় পল্লিতে পর্য্যটন করিতে লাগিল। কোথাকার একটা মলিন গ্রাম্য কুক্কুরকে আদর দিয়া এমনি স্পর্দ্ধিত করিয়া তুলিল যে, সে অনাহূত শরতের সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মল জাজিমের উপর পদপল্লবচতুষ্টয়ের ধূলিরেখায় আপন শুভাগমনসংবাদ স্থায়িভাবে মুদ্রিত করিয়া আসিতে লাগিল। নীলকান্তের চতুর্দ্দিকে দেখিতে দেখিতে একটি সুবৃহৎ ভক্তশিশুসম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল, এবং সে বৎসর গ্রামের আম্রকাননে কচি আম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইল না।

কিরণ এই ছেলেটিকে বড় বেশী আদর দিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরৎ এবং শরতের মা সে বিষয়ে তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা মানিতেন না। শরতের পুরাতন জামা মোজা এবং নূতন ধুতি চাদর জুতা

পরাইয়া তিনি তাহাকে বাবু সাজাইয়া তুলিলেন। মাঝে মাঝে যখন তখন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার স্নেহ এবং কৌতুক উভয়ই চরিতার্থ হইত। কিরণ সহাস্যমুখে পানের বাটা পাশে রাখিয়া খাটের উপর বসিতেন, দাসী তাঁহার ভিজে এলোচুল চিরিয়া চিরিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া শুকাইয়া দিত এবং নীলকান্ত নীচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া নলদময়ন্তীর পালা অভিনয় করিত—এইরূপে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন অত্যন্ত শীঘ্র কাটিয়া যাইত। কিরণ শরৎকে তাঁহার সহিত একাসনে দর্শকশ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু শরৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন এবং শরতের সম্মুখে নীলকান্তের প্রতিভাও সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পাইত না। শাশুড়ি এক একদিন ঠাকুর-দেবতার নাম শুনিবার আশায় আকৃষ্ট হইয়া আসিতেন কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার চিরাভ্যস্ত মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রাবেশ ভক্তিকে অভিভূত এবং তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া দিত।

শরতের কাছ হইতে কানমলা চড়টা চাপড়টা নীলকান্তের অদৃষ্টে প্রায়ই জুটিত; কিন্তু তদপেক্ষা কঠিনতর শাসনপ্রণালীতে আজন্ম অভ্যস্ত থাকাতে সেটা তাহার নিকট অপমান বা বেদনাজনক বোধ হইত না। নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর জল স্থল বিভাগের ন্যায় মানবজন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত; প্রহারের অংশটাই অধিক।

নীলকান্তের ঠিক কত বয়স নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন; যদি চোদ্দ পনেরো হয়, তবে বয়সের অপেক্ষা মুখ অনেক

পাকিয়াছে বলিতে হইবে ; যদি সতেরো আঠারো হয়, তবে বয়সের অনুরূপ পাক ধরে নাই। হয় সে অকাল-পক্ক, নয় সে অকাল-অপক্ক।

আসল কথা এই, সে অতি অল্প বয়সেই যাত্রার দলে ঢুকিয়া রাধিকা, দময়ন্তী, সীতা এবং বিদ্যার সখী সাজিত। অধিকারীর আবশ্যকমত বিধাতার বরে খানিকদূর পর্য্যন্ত বাড়িয়া তাহার বাড় থামিয়া গেল। তাহাকে সকলে ছোটই দেখিত, আপনাকেও সে ছোটই জ্ঞান করিত, বয়সের উপযুক্ত সম্মান সে কাহারও কাছে পাইত না। এই সকল স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক কারণ প্রভাবে সতেরো বৎসর বয়সের সময় তাহাকে অনতিপক্ক সতেরোর অপেক্ষা অতিপরিপক্ক চোদ্দর মত দেখাইত। গোঁফের রেখা না উঠাতে এই ভ্রম আরো দৃঢ়মূল হইয়াছিল। তামাকের ধোঁয়া লাগিয়াই হোক্ বা বয়সানুচিত ভাষা প্রয়োগবশতই হোক্, নীলকান্তের ঠোঁটের কাছটা কিছু বেশী পাকা বোধ হইত, কিন্তু তাহার বৃহৎ তারাবিশিষ্ট দুইটি চক্ষের মধ্যে একটা সারল্য এবং তারুণ্য ছিল। অনুমান করি, নীলকান্তের ভিতরটা স্বভাবতঃ কাঁচা, কিন্তু যাত্রার দলের তা' লাগিয়া উপরিভাগে পক্কতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শরৎ বাবুর আশ্রয়ে চন্দননগরের বাগানে বাস করিতে করিতে নীলকান্তের উপর স্বভাবের নিয়ম অব্যাহতভাবে আপন কাজ করিতে লাগিল। সে এতদিন যে একটা বয়ঃসন্ধি-

স্থলে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘকাল থামিয়া ছিল, এখানে আসিয়া সেটা কখন এক সময় নিঃশব্দে পার হইয়া গেল। তাহার সতেরো আঠারো বৎসরের বয়ঃক্রম বেশ সম্পূর্ণভাবে পরিণত হইয়া উঠিল।

তাহার সে পরিবর্ত্তন বাহির হইতে কাহারও চোখে পড়িল না, কিন্তু তাহার প্রথম লক্ষণ এই, যে, যখন কিরণ নীলকান্তের প্রতি বালকযোগ্য ব্যবহার করিতেন সে মনে মনে লজ্জিত এবং ব্যথিত হইত। একদিন আমোদপ্রিয় কিরণ তাহাকে স্ত্রীবেশে সখী সাজিবার কথা বলিয়াছিলেন, সে কথাটা অকস্মাৎ তাহার বড়ই কষ্টদায়ক লাগিল অথচ তাহার উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। আজকাল তাহাকে যাত্রার অনুকরণ করিতে ডাকিলেই সে অদৃশ্য হইয়া যাইত। সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া যাত্রার দলের ছোকরার অপেক্ষা অধিক কিছু নয় এ কথা কিছুতে তাহার মনে লইত না।

এমন কি, সে বাড়ির সরকারের নিকট কিছু কিছু করিয়া লেখাপড়া শিখিবার সংকল্প করিল। কিন্তু বৌঠাকরুণের স্নেহভাজন বলিয়া নীলকান্তকে সরকার দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না—এবং মনের একাগ্রতা রক্ষা করিয়া পড়াশুনো কোন কালে অভ্যাস না থাকাতে অক্ষরগুলো তাহার চোখের সামে দিয়া ভাসিয়া যাইত। গঙ্গার ধারে চাঁপাতলার গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া কোলের উপর বই খুলিয়া সে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিত; জল ছল্ ছল্ করিত, নৌকা ভাসিয়া যাইত,

শাখার উপরে চঞ্চল অন্যমনস্ক পাখী কিচ্‌মিচ্‌ শব্দে স্বগত উক্তি প্রকাশ করিত, নীলকান্ত বইয়ের পাতায় চক্ষু রাখিয়া কি ভাবিত সেই জানে অথবা সেও জানে না। একটা কথা হইতে কিছুতেই আর একটা কথায় গিয়া পৌঁছিতে পারিত না, অথচ, বই পড়িতেছি মনে করিয়া তাহার ভারি একটা আত্মগৌরব উপস্থিত হইত। সাম্নে দিয়া যখন একটা নৌকা যাইত তখন সে আরও অধিক আড়ম্বরের সহিত বইখানা তুলিয়া লইয়া বিড় বিড় করিয়া পড়ার ভাণ করিত; দর্শক চলিয়া গেলে সে আর পড়ার উৎসাহ রক্ষা করিতে পারিত না।

পূর্ব্বে সে অভ্যস্ত গানগুলো যন্ত্রের মত যথানিয়মে গাহিয়া যাইত, এখন সেই গানের সুরগুলো তাহার মনে এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার করে। গানের কথা অতি যৎসামান্য, তুচ্ছ অনুপ্রাসে পরিপূর্ণ, তাহার অর্থও নীলকান্তের নিকট সম্যক্ বোধগম্য নহে, কিন্তু যখন সে গাহিত—

ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে,
এমন নৃশংস কেন হলি রে,—
বল্‌ কি জন্যে, এ অরণ্যে,
রাজকন্যের প্রাণসংশয় করিলি রে,—

তখন সে যেন সহসা লোকান্তরে জন্মান্তরে উপনীত হইত—তখন চারিদিকের অভ্যস্ত জগৎটা এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জ্জমা হইয়া একটা নূতন চেহারা ধারণ করিত। রাজহংস এবং রাজকন্যার কথা হইতে তাহার মনে

এক অপরূপ ছবির আভাস জাগিয়া উঠিত, সে আপনাকে কি মনে করিত স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না, কিন্তু যাত্রার দলের পিতৃমাতৃহীন ছোকরা বলিয়া ভুলিয়া যাইত। নিতান্ত অকিঞ্চনের ঘরের হতভাগ্য মলিন শিশু যখন সন্ধ্যাশয্যায় শুইয়া, রাজপুত্র, রাজকন্যা এবং সাত রাজার ধন মাণিকের কথা শোনে তখন সেই ক্ষীণ দীপালোকিত জীর্ণ গৃহকোণের অন্ধকারে তাহার মনটা সমস্ত দারিদ্র্য ও হীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক সর্ব্বসম্ভব রূপকথার রাজ্যে একটা নূতন রূপ, উজ্জ্বল বেশ এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা ধারণ করে; সেইরূপ গানের সুরের মধ্যে এই যাত্রার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগৎটিকে একটি নবীন আকারে সৃজন করিয়া তুলিত; জলের ধ্বনি, পাতার শব্দ, পাখীর ডাক, এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন তাঁহার সহাস্য স্নেহমুখচ্ছবি, তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহু দুইখানি এবং দুর্লভ সুন্দর পুষ্পদল-কোমল রক্তিম চরণযুগল কি এক মায়ামন্ত্রবলে রাগিণীর মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আবার এক সময় এই গীতি-মরীচিকা কোথায় অপসারিত হইত, যাত্রার দলের নীলকান্ত ঝাঁকড়া চুল লইয়া প্রকাশ পাইত, আমবাগানের অধ্যক্ষ প্রতিবেশীর অভিযোগক্রমে শরৎ আসিয়া তাহার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড় কসাইয়া দিতেন, এবং বালক ভক্তমণ্ডলীর অধিনায়ক হইয়া নীলকান্ত জলে স্থলে এবং তরুশাখাগ্রে নব নব উপদ্রব সৃজন করিতে বাহির হইত।

ইতিমধ্যে শরতের ভাই সতীশ কলিকাতা কলেজের ছুটিতে বাগানে আসিয়া আশ্রয় লইল। কিরণ ভারি খুসি হই-লেন, তাঁহার হাতে আর একটি কাজ জুটিল; উপবেশনে আহারে আচ্ছাদনে সমবয়স্ক ঠাকুরপোর প্রতি পরিহাসপাশ বিস্তার করিতে লাগিলেন। কখনও হাতে সিঁদূর মাখিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরেন, কখনো তাহার জামার পিঠে বাঁদর লিখিয়া রাখেন, কখনো ঝনাৎ করিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুললিত উচ্চহাস্যে পলায়ন করেন। সতীশও ছাড়িবার পাত্র নহে; সে তাঁহার চাবি চুরি করিয়া, তাঁহার পানের মধ্যে লঙ্কা পূরিয়া, অলক্ষিতে খাটের খুরার সহিত তাঁহার আঁচল বাঁধিয়া প্রতিশোধ তুলিতে থাকে। এইরূপে উভয়ে সমস্ত দিন তর্জ্জন ধাবন হাস্য, এমন কি, মাঝে মাঝে কলহ, ক্রন্দন, সাধাসাধি এবং পুনর্ব্বার শান্তিস্থাপন চলিতে লাগিল।

নীলকান্তকে কি ভূতে পাইল কে জানে! সে কি উপ-লক্ষ করিয়া কাহার সহিত বিবাদ করিবে ভাবিয়া পায় না, অথচ তাহার মন তীব্র তিক্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে তাহার ভক্ত বালকগুলিকে অন্যায়রূপে কাঁদাইতে লাগিল, তাহার সেই পোষা দিশী কুকুরটাকে অকারণে লাথি মারিয়া কেঁই কেঁই শব্দে নভোমণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তুলিল, এমন কি, পথে ভ্রমণের সময় সবেগে ছড়ি মারিয়া আগাছাগুলার শাখা-চ্ছেদন করিয়া চলিতে লাগিল।

যাহারা ভাল খাইতে পারে, তাহাদিগকে সম্মুখে বসিয়া

খাওয়াইতে কিরণ অত্যন্ত ভালবাসেন। ভাল খাইবার ক্ষমতাটা নীলকান্তের ছিল, সুখাদ্য দ্রব্য পুনঃপুনঃ খাইবার অনুরোধ তাহার নিকট কদাচ ব্যর্থ হইত না। এই জন্য কিরণ প্রায় তাহাকে ডাকিয়া লইয়া নিজে থাকিয়া খাওয়াইতেন, এবং এই ব্রাহ্মণ বালকের তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার দেখিয়া তিনি বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। সতীশ আসার পরে অনবসরবশতঃ নীলকান্তের আহারস্থলে প্রায় মাঝে মাঝে কিরণকে অনুপস্থিত থাকিতে হইত;—পূর্ব্বে এরূপ ঘটনায় তাহার ভোজনের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না; সে সর্ব্বশেষে দুধের বাটি ধুইয়া তাহার জলসুদ্ধ খাইয়া তবে উঠিত,—কিন্তু আজকাল কিরণ নিজে ডাকিয়া না খাওয়াইলে তাহার বক্ষ ব্যথিত তাহার মুখ বিস্বাদ হইয়া উঠিত, না খাইয়া উঠিয়া পড়িত; বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দাসীকে বলিয়া যাইত, আমার ক্ষুধা নাই। মনে করিত, কিরণ সংবাদ পাইয়া এখনি অনুতপ্তচিত্তে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, এবং খাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিবেন, সে তথাপি কিছুতেই সে অনুরোধ পালন করিবে না, বলিবে, আমার ক্ষুধা নাই। কিন্তু কিরণকে কেহ সংবাদও দেয় না, কিরণ তাহাকে ডাকিয়াও পাঠান না; খাবার যাহা থাকে দাসী খাইয়া ফেলে। তখন সে আপন শয়নগৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার বিছানার উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া মুখের উপর সবলে বালিশ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে; কিন্তু কি তাহার

নালিশ, কাহার উপরে তাহার দাবী, কে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিবে! যখন কেহই আসে না তখন স্নেহময়ী বিশ্বধাত্রী নিদ্রা আসিয়া ধীরে ধীরে কোমল করস্পর্শে এই মাতৃহীন ব্যথিত বালকের অভিমান শান্ত করিয়া দেন।

নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা হইল সতীশ কিরণের কাছে তাহার নামে সর্ব্বদাই লাগায়; যে দিন কিরণ কোন কারণে গম্ভীর হইয়া থাকিতেন সে দিন নীলকান্ত মনে করিত, সতীশের চক্রান্তে কিরণ তাহারই উপর রাগ করিয়া আছেন।

এখন হইতে নীলকান্ত একমনে তীব্র আকাঙ্ক্ষার সহিত সর্ব্বদাই দেবতার নিকট প্রার্থনা করে, আর জন্মে আমি যেন সতীশ হই, এবং সতীশ যেন আমি হয়। সে জানিত ব্রাহ্মণের একান্তমনের অভিশাপ কখন নিষ্ফল হয় না, এই জন্য সে মনে মনে সতীশকে ব্রহ্মতেজে দগ্ধ করিতে গিয়া নিজে দগ্ধ হইতে থাকিত, এবং উপরের তলা হইতে সতীশ ও তাহার বৌঠাকুরাণীর উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যমিশ্রিত পরিহাসকলরব শুনিতে পাইত।

নীলকান্ত স্পষ্টতঃ সতীশের কোনরূপ শত্রুতা করিতে সাহস করিত না, কিন্তু সুযোগমত তাহার ছোটখাট অসুবিধা ঘটাইয়া প্রীতিলাভ করিত। ঘাটের সোপানে সাবান রাখিয়া সতীশ যখন গঙ্গায় নামিয়া ডুব দিতে আরম্ভ করিত, তখন নীলকান্ত ফস্ করিয়া আসিয়া সাবান চুরি করিয়া লইত— সতীশ যথাকালে সাবানের সন্ধানে আসিয়া দেখিত সাবান

নাই। একদিন নাহিতে নাহিতে হঠাৎ দেখিল তাহার বিশেষ সখের চিকনের কাজ করা জামাটি গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাই-তেছে, ভাবিল হাওয়ায় উড়িয়া গেছে, কিন্তু হাওয়াটা কোন দিক্ হইতে বহিল তাহা কেহ জানে না।

একদিন সতীশকে আমোদ দিবার জন্য কিরণ নীলকান্তকে ডাকিয়া তাহাকে যাত্রার গান গাহিতে বলিলেন—নীলকান্ত নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিরণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, তোর আবার কি হলরে? নীলকান্ত তাহার জবাব দিল না। কিরণ পুনশ্চ বলিলেন, সেই গানটা গা না!—সে আমি ভুলে গেছি বলিয়া নীলকান্ত চলিয়া গেল।

অবশেষে কিরণের দেশে ফিরিবার সময় হইল। সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিল;—সতীশও সঙ্গে যাইবে। কিন্তু নীল-কান্তকে কেহ কোন কথাই বলে না। সে সঙ্গে যাইবে কি থাকিবে সে প্রশ্নমাত্র কাহারও মনে উদয় হয় না।

কিরণ নীলকান্তকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শাশুড়ি স্বামী এবং দেবর সকলেই একবাক্যে আপত্তি করিয়া উঠিলেন, কিরণও তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। অবশেষে যাত্রার দুই দিন আগে ব্রাহ্মণ বালককে ডাকিয়া কিরণ তাহাকে স্নেহবাক্যে স্বদেশে যাইতে উপদেশ করিলেন।

সে উপরি উপরি কয় দিন অবহেলার পর মিষ্টবাক্য শুনিতে পাইয়া আর থাকিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। কিরণেরও চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল;—যাহাকে

চিরকাল কাছে রাখা যাইবে না, তাহাকে কিছুদিন আদর দিয়া তাহার মায়া বসিতে দেওয়া ভাল হয় নাই বলিয়া কির-ণের মনে বড় অনুতাপ উপস্থিত হইল।

সতীশ কাছে উপস্থিত ছিল, সে অতবড় ছেলের কান্না দেখিয়া ভারি বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—আরে মোলো! কথা নাই বার্ত্তা নাই, একেবারে কাঁদিয়াই অস্থির!—

কিরণ এই কঠোর উক্তির জন্য সতীশকে ভৎসনা করি-লেন; সতীশ কহিল, তুমি বোঝ না বৌদিদি, তুমি সকলকেই বড় বেশি বিশ্বাস কর; কোথাকার কে তাহার ঠিক নাই, এখানে আসিয়া দিব্য রাজার হালে আছে। আবার পুনর্মূ-ষিক হইবার আশঙ্কায় আজ মায়া-কান্না জুড়িয়াছে—ও বেশ জানে যে দু ফোঁটা চখের জল ফেলিলেই তুমি গলিয়া যাইবে।

নীলকান্ত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল;—কিন্তু তাহার মনটা সতীশের কাল্পনিক মূর্ত্তিকে ছুরি হইয়া কাটিতে লাগিল, ছুঁচ হইয়া বিঁধিতে লাগিল, আগুন হইয়া জ্বালাইতে লাগিল, কিন্তু প্রকৃত সতীশের গায়ে একটি চিহ্নমাত্র বসিল না, কেবল তাহারই মর্ম্মস্থল হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সতীশ একটি সৌখীন দোয়াতদান কিনিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে দুই পাশে দুই ঝিনুকের নৌকার উপর দোয়াত বসান, এবং মাঝে একটা জর্ম্মন্‌ রৌপ্যের হাঁস উন্মুক্ত চঞ্চুপুটে কলম লইয়া পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে, সেটির প্রতি সতীশের অত্যন্ত যত্ন ছিল; প্রায় সে মাঝে মাঝে সিল্কের

রুমাল দিয়া অতি যত্নে সেটি ঝাড়পোঁচ করিত। কিরণ প্রায়ই পরিহাস করিয়া সেই রৌপ্যহংসের চঞ্চু-অগ্রভাগে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া বলিতেন, ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে এমন নৃশংস কেন হলি রে—এবং ইহাই উপলক্ষ করিয়া দেবরে তাঁহাতে হাস্যকৌতুকের বাগ্‌যুদ্ধ চলিত!

স্বদেশযাত্রার আগের দিন সকাল-বেলায় সে জিনিষটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কিরণ হাসিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, তোমার রাজহংস তোমার দময়ন্তীর অন্বেষণে উড়িয়াছে।

কিন্তু সতীশ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। নীলকান্তই যে সেটা চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না—গতকল্য সন্ধ্যার সময় তাহাকে সতীশের ঘরের কাছে ঘুর ঘুর করিতে দেখিয়াছে এমন সাক্ষীও পাওয়া গেল।

সতীশের সম্মুখে অপরাধী আনীত হইল। সেখানে কিরণও উপস্থিত ছিলেন। সতীশ একেবারেই তাহাকে বলিয়া উঠিলেন, তুই আমার দোয়াত চুরি করে' কোথায় রেখেছিস্, এনে দে!

নীলকান্ত নানা অপরাধে এবং বিনা অপরাধেও শরতের কাছে অনেক মার খাইয়াছে, এবং বরাবর প্রফুল্লচিত্তে তাহা বহন করিয়াছে। কিন্তু কিরণের সম্মুখে যখন তাহার নামে দোয়াৎ চুরির অপবাদ আসিল, তখন তাহার বড় বড় দুই চোখ আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল; তাহার বুকের কাছটা ফুলিয়া কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া উঠিল; সতীশ আর একটা কথা

বলিলেই সে তাহার দুই হাতের দশ নখ লইয়া ক্রুদ্ধ বিড়াল-শাবকের মত সতীশের উপর গিয়া পড়িত।

তখন কিরণ তাহাকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া মৃদুমিষ্ট-স্বরে বলিলেন—নীলু, যদি সেই দোয়াৎটা নিয়ে থাকিস্ আমাকে আস্তে আস্তে দিয়ে যা, তোকে কেউ কিছু বল্‌বে না!

নীলকান্তর চোখ ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অবশেষে সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিরণ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, নীলকান্ত কখনই চুরি করে নি!

শরৎ এবং সতীশ উভয়েই বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয়, নীলকান্ত ছাড়া আর কেহই চুরি করেনি।

কিরণ সবলে বলিলেন, কখনই না।

শরৎ নীলকান্তকে ডাকিয়া সওয়াল করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিরণ বলিলেন, না, উহাকে এই চুরি সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।

সতীশ কহিলেন, উহার ঘর এবং বাক্স খুঁজিয়া দেখা উচিত।

কিরণ বলিলেন, তাহা যদি কর, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার জন্মশোধ আড়ি হইবে। নির্দ্দোষীর প্রতি কোন-রূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পাইবে না।

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের পাতা দুই ফোঁটা জলে ভিজিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দুটি করুণ চক্ষুর অশ্রুজলের

দোহাই মানিয়া নীলকান্তের প্রতি আর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইল না।

নিরীহ আশ্রিত বালকের প্রতি এইরূপ অত্যাচারে কির-ণের মনে অত্যন্ত দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভাল দুই জোড়া ফরাসডাঙ্গার ধূতি চাদর, দুইটি জামা, এক জোড়া নূতন জুতা এবং একখানি দশ টাকার নোট লইয়া সন্ধ্যাবেলায় নীলকান্তের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নীলকান্তকে না বলিয়া সেই স্নেহ-উপহারগুলি আস্তে আস্তে তাহার বাক্সর মধ্যে রাখিয়া আসিবেন। টিনের বাক্সটিও তাঁহার দত্ত।

আঁচল হইতে চাবির গোচ্ছা লইয়া নিঃশব্দে সেই বাক্স খুলিলেন। কিন্তু তাঁহার উপহারগুলি ধরাইতে পারিলেন না। বাক্সর মধ্যে লাঠাই, কঞ্চি, কাঁচা আম কাটিবার জন্য ঘষা ঝিনুক, ভাঙ্গা গ্লাসের তলা প্রভৃতি নানা জাতীয় পদার্থ স্তূপা-কারে রক্ষিত।

কিরণ ভাবিলেন, বাক্সটি ভাল করিয়া গুছাইয়া তাহার মধ্যে সকল জিনিষ ধরাইতে পারিবেন। সেই উদ্দেশে বাক্সটি খালি করিতে লাগিলেন। প্রথমে লাঠাই লাঠিম ছুরি ছড়ি প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল—তাহার পরে খান কয়েক ময়লা এবং কাচা কাপড় বাহির হইল, তাহার পরে সকলের নীচে হঠাৎ সতীশের সেই বহুযত্নের রাজহংসশোভিত দোয়াত-দানটি বাহির হইয়া আসিল।

কিরণ আশ্চর্য্য হইয়া আরক্তিমমুখে অনেকক্ষণ সেটি হাতে করিয়া লইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কখন্ নীলকান্ত পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিল তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। নীলকান্ত সমস্তই দেখিল; মনে করিল কিরণ স্বয়ং চোরের মত তাহার চুরি ধরিতে আসিয়াছেন, এবং তাহার চুরিও ধরা পড়িয়াছে। সে যে সামান্য চোরের মত লোভে পড়িয়া চুরি করে নাই, সে যে কেবল প্রতিহিংসাসাধনের জন্য এ কাজ করিয়াছে, সে যে ঐ জিনিষটা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কেবল এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতাবশতঃ ফেলিয়া না দিয়া নিজের বাক্সর মধ্যে পুরিয়াছে, সে সকল কথা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে! সে চোর নয়, সে চোর নয়! তবে সে কি? কেমন করিয়া বলিবে সে কি! সে চুরি করিয়াছে, কিন্তু সে চোর নহে; কিরণ যে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন এ নিষ্ঠুর অন্যায় সে কিছুতেই বুঝাইতেও পারিবে না, বহন করিতেও পারিবে না।

কিরণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই দোয়াতদানটা বাক্সর ভিতরে রাখিলেন। চোরের মত তাহার উপরে ময়লা কাপড় চাপা দিলেন, তাহার উপর বালকের লাঠাই লাঠি লাঠিম ঝিনুক কাঁচের টুক্‌রা প্রভৃতি সমস্তই রাখিলেন, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার উপহারগুলি ও দশ টাকার নোটটি সাজাইয়া রাখিলেন।

কিন্তু পরের দিন সেই ব্রাহ্মণ বালকের কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, তাহাকে দেখে নাই; পুলিস বলিল তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তখন শরৎ বলিল, এইবার নীলকণ্ঠের বাক্সটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্।

কিরণ জেদ্ করিয়া বলিলেন, সে কিছুতেই হইবে না।

বলিয়া বাক্সটি আপন ঘরে আনাইয়া দোয়াৎটি বাহির করিয়া গোপনে গঙ্গার জলে ফেলিয়া আসিলেন।

শরৎ সপরিবারে দেশে চলিয়া গেলেন; বাগান একদিনে শূন্য হইয়া গেল; কেবল নীলকান্তের সেই পোষা গ্রাম্য কুকুরটা আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দিদি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পল্লীবাসিনী কোন এক হতভাগিনীর অন্যায়কারী অত্যাচারী স্বামীর দুষ্কৃতি সকল সবিস্তারে বর্ণন পূর্ব্বক প্রতিবেশিনী তারা অত্যন্ত সংক্ষেপে নিজের রায় প্রকাশ করিয়া কহিল এমন স্বামীর মুখে আগুন।

শুনিয়া জয়গোপাল বাবুর স্ত্রী শশি অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিলেন;—স্বামী-জাতির মুখে চুরটের আগুন ছাড়া অন্য কোন প্রকার আগুন কোন অবস্থাতেই কামনা করা স্ত্রী-জাতিকে শোভা পায় না।

অতএব এ সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ প্রকাশ করাতে কঠিন-হৃদয় তারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কহিল এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাতজন্ম বিধবা হওয়া ভাল। এই বলিয়া সে সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল।

শশি মনে মনে কহিল, স্বামীর এমন কোন অপরাধ কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে তাঁহার প্রতি মনের ভাব এত কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। এই কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতেই তাহার কোমল হৃদয়ের সমস্ত

প্রীতিরস তাহার প্রবাসী স্বামীর অভিমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; শয্যাতলে তাহার স্বামী যে অংশে শয়ন করিত সেই অংশের উপর বাহু প্রসারণ করিয়া পড়িয়া শূন্য বালিশকে চুম্বন করিল, বালিশের মধ্যে স্বামীর মাথার আঘ্রাণ অনুভব করিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাঠের বাক্স হইতে স্বামীর একখানি বহুকালের লুপ্তপ্রায় ফোটোগ্রাফ এবং হাতের লেখা চিঠিগুলি বাহির করিয়া বসিল। সেদিনকার নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন এইরূপে নিভৃত কক্ষে, নির্জ্জন চিন্তায়, পুরাতন স্মৃতিতে এবং বিষাদের অশ্রুজলে কাটিয়া গেল।

শশিকলা এবং জয়গোপালের যে নবদাম্পত্য তাহা নহে। বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, ইতিমধ্যে সন্তানাদিও হইয়াছে। উভয়ে বহুকাল একত্র অবস্থান করিয়া নিতান্ত সহজ সাধারণ ভাবেই দিন কাটিয়াছে; কোন পক্ষেই অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাসের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। প্রায় ষোল বৎসর একাদিক্রমে অবিচ্ছেদে যাপন করিয়া হঠাৎ কর্ম্মবশে তাহার স্বামী বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পর শশির মনে একটা প্রবল প্রেমাবেগ জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিরহের দ্বারা বন্ধনে যতই টান পড়িল কোমল হৃদয়ে প্রেমের ফাঁশ ততই শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিল; ঢিলা অবস্থায় যাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে নাই এখন তাহার বেদনা টন্‌টন্ করিতে লাগিল।

তাই আজ এতদিন পরে এত বয়সে ছেলের মা হইয়া শশি বসন্তমধ্যাহ্নে নির্জ্জন ঘরে বিরহশয্যায় উন্মেষিতযৌবনা

নববধূর সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে প্রেম অজ্ঞাতভাবে জীবনের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সহসা আজ তাহারই কলগীতিশব্দে জাগ্রত হইয়া মনে মনে তাহারই উজান বাহিয়া দুই তীরে বহু দূরে অনেক সোণার পুরী অনেক কুঞ্জবন দেখিতে লাগিল ;—কিন্তু সেই অতীত সুখসম্ভাবনার মধ্যে এখন আর পদার্পণ করিবার স্থান নাই। মনে করিতে লাগিল এইবার যখন স্বামীকে নিকটে পাইব, তখন জীবনকে নীরস এবং বসন্তকে নিষ্ফল হইতে দিব না। কতদিন কতবার তুচ্ছতর্কে সামান্য কলহে স্বামীর প্রতি সে উপদ্রব করিয়াছে আজ অনুতপ্তচিত্তে একান্ত মনে সঙ্কল্প করিল আর কখনই সে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবে না, স্বামীর ইচ্ছায় বাধা দিবে না, স্বামীর আদেশ পালন করিবে, প্রীতিপূর্ণ নম্রহৃদয়ে নীরবে স্বামীর ভালমন্দ সমস্ত আচরণ সহ্য করিবে ; কারণ, স্বামী সর্ব্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা।

অনেকদিন পর্য্যন্ত শশিকলা তাহার পিতামাতার একমাত্র আদরের কন্যা ছিল। সেই জন্য, জয়গোপাল যদিও সামান্য চাকরি করিত, তবু ভবিষ্যতের জন্য তাহার কিছুমাত্র ভাবনা ছিল না। পল্লিগ্রামে রাজভোগে থাকিবার পক্ষে তাহার শ্বশুরের যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল।

এমন সময় নিতান্ত অকালে প্রায় বৃদ্ধবয়সে শশিকলার পিতা কালীপ্রসন্নের একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। সত্য কথা বলিতে কি, পিতামাতার এইরূপ অনপেক্ষিত অসঙ্গত অন্যায়

আচরণে শশি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; জয়গোপালও সবিশেষ প্রীতিলাভ করে নাই।

অধিক বয়সের ছেলেটির প্রতি পিতামাতার স্নেহ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এই নবাগত, ক্ষুদ্রকায়, স্তন্যপিপাসু, নিদ্রাতুর শ্যালকটি অজ্ঞাতসারে দুই দুর্ব্বল হস্তের অতি ক্ষুদ্র বদ্ধমুষ্টির মধ্যে জয়গোপালের সমস্ত আশা ভরসা যখন অপহরণ করিয়া বসিল, তখন সে আসামের চা-বাগানে এক চাকরি লইল।

নিকটবর্ত্তী স্থানে চাক্‌রির সন্ধান করিতে সকলেই তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল—কিন্তু সর্ব্বসাধারণের উপর রাগ করিয়াই হউক, অথবা চা-বাগানে দ্রুত বাড়িয়া উঠিবার কোন উপায় জানিয়াই হউক, জয়গোপাল কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না; শশিকে সন্তানসহ তাহার বাপের বাড়ি রাখিয়া সে আসামে চলিয়া গেল। বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রীর এই প্রথম বিচ্ছেদ।

এই ঘটনায় শিশু ভ্রাতাটির প্রতি শশিকলার ভারি রাগ হইল। যে মনের আক্ষেপ মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই, তাহারই আক্রোশটা সব চেয়ে বেশী হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি আরামে স্তনপান করিতে ও চক্ষু মুদিয়া নিদ্রা দিতে লাগিল এবং তাহার বড় ভগিনীটি দুধ গরম, ভাত ঠাণ্ডা, ছেলের ইস্কুলে যাওয়ার দেরি প্রভৃতি নানা উপলক্ষে নিশিদিন মান অভিমান করিয়া অস্থির হইল এবং অস্থির করিয়া তুলিল।

অল্পদিনের মধ্যেই ছেলেটির মার মৃত্যু হইল; মরিবার পূর্ব্বে জননী তাঁহার কন্যার হাতে শিশুপুত্রটিকে সমর্পণ করিয়া দিয়া গেলেন।

তখন অনতিবিলম্বেই সেই মাতৃহীন ছেলেটি অনায়াসেই তাহার দিদির হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। হুহুঙ্কার শব্দ পূর্ব্বক সে যখন তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরম আগ্রহের সহিত দন্তহীন ক্ষুদ্র মুখের মধ্যে তাঁহার মুখ চক্ষু নাসিকা সমস্তটা গ্রাস করিবার চেষ্টা করিত, ক্ষুদ্র মুষ্টির মধ্যে তাঁহার কেশগুচ্ছ লইয়া কিছুতেই দখল ছাড়িতে চাহিত না, সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই জাগিয়া উঠিয়া গড়াইয়া তাঁহার গায়ের কাছে আসিয়া কোমল স্পর্শে তাঁহাকে পুলকিত করিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়া দিত;—যখন ক্রমে সে তাঁহাকে জিজি এবং জিজিমা বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং কাজকর্ম্ম ও অবসরের সময় নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া, নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়া, নিষিদ্ধ স্থানে গমনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বিধিমত উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল, তখন শশি আর থাকিতে পারিলেন না। এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষুদ্র অত্যাচারীর নিকটে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিলেন। ছেলেটির মা ছিল না বলিয়া তাহার প্রতি তাঁহার আধিপত্য ঢের বেশী হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছেলেটির নাম হইল নীলমণি। তাহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাহার পিতার কঠিন পীড়া হইল। অতি শীঘ্র চলিয়া আসিবার জন্য জয়গোপালের নিকট পত্র গেল। জয়গোপাল যখন বহু চেষ্টায় ছুটি লইয়া আসিয়া পৌঁছিল তখন কালী-প্রসন্নের মৃত্যুকাল উপস্থিত।

মৃত্যুর পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন, নাবালক ছেলেটির তত্ত্বাবধানের ভার জয়গোপালের প্রতি অর্পণ করিয়া তাঁহার বিষয়ের সিকি অংশ কন্যার নামে লিখিয়া দিলেন।

সুতরাং বিষয়-রক্ষার জন্য জয়গোপালকে কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

অনেক দিনের পরে স্বামীস্ত্রীর পুনর্ম্মিলন হইল। একটা জড়পদার্থ ভাঙিয়া গেলে আবার ঠিক তাহার খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু দুটি মানুষকে যেখানে বিচ্ছিন্ন করা হয়, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না;—কারণ, মন জিনিষটা সজীব পদার্থ; নিমেষে নিমেষে তাহার পরিণতি এবং পরিবর্ত্তন।

শশির পক্ষে এই নূতন মিলনে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সে যেন তাহার স্বামীকে ফিরিয়া বিবাহ করিল। পুরাতন দাম্পত্যের মধ্যে চিরাভ্যাসবশতঃ যে এক অসাড়তা জন্মিয়া গিয়াছিল, বিরহের আকর্ষণে তাহা অপসৃত হইয়া সে তাহার

স্বামীকে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণতর ভাবে প্রাপ্ত হইল,—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন দিনই আসুক্, যতদিনই যাক্, স্বামীর প্রতি এই দীপ্ত প্রেমের উজ্জ্বলতাকে কখনই ম্লান হইতে দিব না।

নূতন মিলনে জয়গোপালের মনের অবস্থাটা অন্তরূপ। পূর্ব্বে যখন উভয়ে অবিচ্ছেদে একত্র ছিল যখন স্ত্রীর সহিত তাহার সমস্ত স্বার্থের এবং বিচিত্র অভ্যাসের ঐক্যবন্ধন ছিল, স্ত্রী তখন জীবনের একটি নিত্য সত্য হইয়াছিল,—তাহাকে বাদ দিতে গেলে দৈনিক অভ্যাসজালের মধ্যে সহসা অনেকখানি ফাঁক পড়িত। এই জন্য বিদেশে গিয়া জয়গোপাল প্রথম প্রথম অগাধ জলের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার সেই অভ্যাস-বিচ্ছেদের মধ্যে নূতন অভ্যাসের তালি লাগিয়া গেল।

কেবল তাহাই নহে। পূর্ব্বে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নিশ্চিন্তভাবে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। মাঝে দুই বৎসর, অবস্থা-উন্নতি-চেষ্টা তাহার মনে এমন প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার মনের সম্মুখে আর কিছুই ছিল না। এই নূতন নেশার তীব্রতার তুলনায় তাহার পূর্ব্বজীবন বস্তুহীন ছায়ার মত দেখাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্ত্তন ঘটায় প্রেম, এবং পুরুষের ঘটায় দুশ্চেষ্টা।

জয়গোপাল দুই বৎসর পরে আসিয়া অবিকল তাহার পূর্ব্ব স্ত্রীটিকে ফিরিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রীর জীবনে শিশু

স্থালকটি একটা নূতন পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই অংশটি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত,—এই অংশে স্ত্রীর সহিত তাহার কোন যোগ নাই। স্ত্রী তাহাকে আপনার এই শিশু-স্নেহের ভাগ দিবার অনেক চেষ্টা করিত—কিন্তু ঠিক কৃতকার্য্য হইত কি না, বলিতে পারি না।

শশি নীলমণিকে কোলে করিয়া আনিয়া হাস্যমুখে তাহার স্বামীর সম্মুখে ধরিত—নীলমণি প্রাণপণে শশির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ লুকাইত, কোন প্রকার কুটুম্বিতার খাতির মানিত না। শশির ইচ্ছা, তাহার এই ক্ষুদ্র ভ্রাতাটির যত প্রকার মন ভুলাইবার বিদ্যা আয়ত্ত আছে, সবগুলি জয়-গোপালের নিকট প্রকাশ হয়; কিন্তু জয়গোপালও সে জন্য বিশেষ আগ্রহ অনুভব করিত না এবং শিশুটিও বিশেষ উৎসাহ দেখাইত না। জয়গোপাল কিছুতেই বুঝিতে পারিত না এই কৃশকায় বৃহৎমস্তক গম্ভীরমুখ শ্যামবর্ণ ছেলেটার মধ্যে এমন কি আছে যে জন্য তাহার প্রতি এতটা স্নেহের অপব্যয় করা হইতেছে।

ভালবাসার ভাবগতিক মেয়েরা খুব চট্ করিয়া বোঝে। শশি অবিলম্বেই বুঝিল জয়গোপাল নীলমণির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত নহে। তখন ভাইটিকে সে বিশেষ সাবধানে আড়াল করিয়া রাখিত—স্বামীর স্নেহহীন বিরাগদৃষ্টি হইতে তাহাকে তফাতে রাখিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে ছেলেটি তাহার গোপন যত্নের ধন, তাহার একলার স্নেহের সামগ্রী হইয়া উঠিল।

সকলেই জানেন, স্নেহ যত গোপনের, যত নির্জ্জনের হয়, ততই প্রবল হইতে থাকে।

নীলমণি কাঁদিলে জয়গোপাল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিত—এই জন্য শশি তাহাকে তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে চাপিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া বুক দিয়া তাহার কান্না থামাইবার চেষ্টা করিত;—বিশেষতঃ নীলমণির কান্নায় যদি রাত্রে তাহার স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত হইত, এবং স্বামী এই ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেটার প্রতি অত্যন্ত হিংস্রভাবে ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক জর্জ্জর-চিত্তে গর্জ্জন করিয়া উঠিত তখন শশি যেন অপরাধিনীর মত সঙ্কুচিত শশব্যস্ত হইয়া পড়িত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে করিয়া দূরে লইয়া গিয়া একান্ত সানুনয় স্নেহের স্বরে সোনা আমার, ধন আমার, মাণিক আমার বলিয়া ঘুম পাড়াইতে থাকিত।

ছেলেতে ছেলেতে নানা উপলক্ষে ঝগড়া বিবাদ হইয়াই থাকে। পূর্ব্বে এরূপ স্থলে শশি নিজের ছেলেদের দণ্ড দিয়া ভাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করিত, কারণ, তাহার মা ছিল না। এখন বিচারকের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধির পরিবর্ত্তন হইল। এখন সর্ব্বদাই নিরপরাধে এবং অবিচারে নীলমণিকে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। সেই অন্যায় শশির বক্ষে শেলের মত বাজিত; তাই সে দণ্ডিত ভ্রাতাকে ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে মিষ্ট দিয়া খেলেনা দিয়া আদর করিয়া চুমো খাইয়া শিশুর আহত হৃদয়ে যথাসাধ্য সান্ত্বনা বিধান করিবার চেষ্টা করিত।

ফলতঃ দেখা গেল, শশি নীলমণিকে যতই ভালবাসে জয়গোপাল নীলমণির প্রতি ততই বিরক্ত হয়; আবার জয়গোপাল নীলমণির প্রতি যতই বিরাগ প্রকাশ করে, শশি তাহাকে ততই স্নেহসুধায় অভিষিক্ত করিয়া দিতে থাকে।

জয়গোপাল লোকটা কখনও তাহার স্ত্রীর প্রতি কোনরূপ কঠোর ব্যবহার করে না এবং শশি নীরবে নম্রভাবে প্রীতির সহিত তাহার স্বামীর সেবা করিয়া থাকে, কেবল এই নীলমণিকে লইয়া ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল।

এইরূপ নীরব দ্বন্দ্বের গোপন আঘাত প্রতিঘাত প্রকাশ্য বিবাদের অপেক্ষা ঢের বেশী দুঃসহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নীলমণির সমস্ত শরীরের মধ্যে মাথাটাই সর্ব্বপ্রধান ছিল। দেখিলে মনে হইত বিধাতা যেন একটা সরু কাঠির মধ্যে ফুঁ দিয়া তাহার ডগার উপরে একটা বড় বুদ্বুদ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে আশঙ্কা প্রকাশ করিত ছেলেটি এইরূপ বুদ্বুদের মতই ক্ষণভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী হইবে। অনেক দিন পর্য্যন্ত সে কথা কহিতে এবং চলিতে শেখে নাই। তাহার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ দেখিয়া বোধ হইত, তাহার পিতা-

মাতা তাঁহাদের অধিক বয়সের সমস্ত চিন্তাভার এই ক্ষুদ্র শিশুর মাথার উপরে চাপাইয়া দিয়া গেছেন।

দিদির যত্নে ও সেবায় নীলমণি তাহার বিপদের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ছয় বৎসরে পা ছিল।

কার্ত্তিকমাসে ভাইফোঁটার দিনে নূতন জামা, চাদর এবং একখানি লালপেড়ে ধুতি পরাইয়া বাবু সাজাইয়া নীলমণিকে শশি ভাইফোঁটা দিতেছেন এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত স্পষ্টভাষিণী প্রতিবেশিনী তারা আসিয়া কথায় কথায় শশির সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

সে কহিল, গোপনে ভাইয়ের সর্ব্বনাশ করিয়া ঘটা করিয়া ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিবার কোন ফল নাই।

শুনিয়া শশি বিস্ময়ে ক্রোধে বেদনায় বজ্রাহত হইল। অবশেষে শুনিতে পাইল, তাহারা স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া নাবালক নীলমণির সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম করাইয়া তাহার স্বামীর পিস্‌তুতো ভাইয়ের নামে বেনামী করিয়া কিনিতেছে।

শুনিয়া শশি অভিশাপ দিল, যাহারা এতবড় মিথ্যা কথা রটনা করিতে পারে তাহাদের মুখে কুষ্ঠ হউক্।

এই বলিয়া সরোদনে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া জনশ্রুতির কথা তাহাকে জানাইল।

জয়গোপাল কহিল আজকালকার দিনে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার যো নাই। উপেন্ আমার আপন পিস্‌তুতো ভাই,

তাহার উপরে বিষয়ের ভার দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম—সে কখন্ গোপনে খাজনা বাকি ফেলিয়া মহল হাসিল্‌পুর নিজে কিনিয়া লইয়াছে আমি জানিতেও পারি নাই।

শশি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, নালিশ করিবে না?

জয়গোপাল কহিল, ভাইয়ের নামে নালিশ করি কি করিয়া? এবং নালিশ করিয়াও ত কোন ফল নাই, কেবল অর্থ নষ্ট।

স্বামীর কথা বিশ্বাস করা শশির পরমকর্ত্তব্য, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন এই সুখের সংসার এই প্রেমের গার্হস্থ্য সহসা তাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভৎস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল। যে সংসারকে আপনার পরম আশ্রয় বলিয়া মনে হইত—হঠাৎ দেখিল সে একটা নিষ্ঠুর স্বার্থের ফাঁদ—তাহাদের দুটি ভাইবোনকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সে একা স্ত্রীলোক, অসহায় নীলমণিকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিয়া কূল কিনারা পাইল না। যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই ভয়ে এবং ঘৃণায় এবং বিপন্ন বালক ভ্রাতাটির প্রতি অপরিসীম স্নেহে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে যদি উপায় জানিত তবে লাট্‌সাহেবের নিকট নিবেদন করিয়া, এমন কি, মহারাণীর নিকট পত্র লিখিয়া তাহার ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিত। মহারাণী কখনই নীলমণির বার্ষিক সাত শ আটান্ন টাকার মুনফার হাসিলপুর মহল বিক্রয় হইতে দিতেন না।

এইরূপে শশি যখন একেবারে মহারাণীর নিকট দরবার করিয়া তাহার পিস্‌তুতো দেবরকে সম্পূর্ণ জব্দ করিয়া দিবার উপায় চিন্তা করিতেছে তখন হঠাৎ নীলমণির জ্বর আসিয়া আক্ষেপসহকারে মূর্চ্ছা হইতে লাগিল।

জয়গোপাল এক গ্রাম্য নেটিভ ডাক্তারকে ডাকিল। শশি ভাল ডাক্তারের জন্য অনুরোধ করাতে জয়গোপাল বলিল, কেন মতিলাল মন্দ ডাক্তার কি!

শশি তখন তাঁহার পায়ে পড়িল, মাথার দিব্য দিল; জয়-গোপাল বলিল, আচ্ছা সহর হইতে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাই-তেছি।

শশি নীলমণিকে কোলে করিয়া বুকে করিয়া পড়িয়া রহিল। নীলমণিও তাহাকে এক দণ্ড চোখের আড়াল হইতে দেয় না; পাছে ফাঁকি দিয়া পালায় এই ভয়ে তাহাকে জড়া-ইয়া থাকে; এমন কি, ঘুমাইয়া পড়িলেও আঁচলটি ছাড়ে না।

সমস্ত দিন এমনি ভাবে কাটিলে সন্ধ্যার পর জয়গোপাল আসিয়া বলিল—সহরে ডাক্তার বাবুকে পাওয়া গেল না, তিনি দূরে কোথায় রোগী দেখিতে গিয়াছেন। ইহাও বলিল, মক-দ্দমা উপলক্ষে আমাকে আজই অন্যত্র যাইতে হইতেছে; আমি মতিলালকে বলিয়া গেলাম সে নিয়মিত আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইবে।

রাত্রে নীলমণি ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিল। প্রাতঃকালেই শশি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া রোগী ভ্রাতাকে লইয়া নৌকা

চড়িয়া একবারে সহরে গিয়া ডাক্তারের বাড়ি উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাড়িতে আছেন—সহর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। ভদ্র স্ত্রীলোক দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাসা ঠিক করিয়া একটি প্রাচীনা বিধবার তত্ত্বাবধানে শশিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং ছেলেটির চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

পরদিনই জয়গোপাল আসিয়া উপস্থিত। ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ফিরিতে অনুমতি করিল।

স্ত্রী কহিল, আমাকে যদি কাটিয়া ফেল তবু আমি এখন ফিরিব না। তোমরা আমার নীলমণিকে মারিয়া ফেলিতে চাও—উহার মা নাই, বাপ নাই, আমি ছাড়া উহার আর কেহ নাই—আমি উহাকে রক্ষা করিব।

জয়গোপাল রাগিয়া কহিল, তবে এই খানেই থাক, তুমি আর আমার ঘরে ফিরিয়ো না।

শশি তখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিল ঘর তোমার কি! আমার ভাইয়েরই ত ঘর!

জয়গোপাল কহিল—আচ্ছা সে দেখা যাইবে!

পাড়ার লোকে এই ঘটনায় কিছুদিন খুব আন্দোলন করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী তারা কহিল, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিতে হয় ঘরে বসিয়া কর না বাপু। ঘর ছাড়িয়া যাইবার আবশ্যক কি! হাজার হোক্ স্বামী ত বটে।

সঙ্গে যাহা টাকা ছিল সমস্ত খরচ করিয়া গহনাপত্র বেচিয়া শশি তাহার ভাইকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল। তখন সে

খবর পাইল, হরিগ্রামে তাহাদের যে বড় জোৎ ছিল, যে জোতের উপরে তাহাদের বাড়ি, নানা রূপে যাহার আয় প্রায় বার্ষিক দেড় হাজার টাকা হইবে সেই জোৎটি জমিদারের সহিত যোগ করিয়া জয়গোপাল নিজের নামে খারিজ করিয়া লইয়াছে। এখন বিষয়টি সমস্তই তাহাদের—তাহার ভাইয়ের নহে।

ব্যামো হইতে সারিয়া উঠিয়া নীলমণি, করুণস্বরে বলিতে লাগিল, দিদি, বাড়ি চল। সেখানে তাহার সঙ্গী ভাগিনেয়দের জন্ত তাহার মন-কেমন করিতেছে। তাই বারম্বার বলিল, দিদি আমাদের সেই ঘরে চল না, দিদি! শুনিয়া দিদি কাঁদিতে লাগিল। আমাদের ঘর আর কোথায়!

কিন্তু কেবল কাঁদিয়া কোন ফল নাই—তখন পৃথিবীতে দিদি ছাড়া তাহার ভাইয়ের আর কেহ ছিল না। ইহা ভাবিয়া চোখের জল মুছিয়া শশি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ তারিণী বাবুর অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ধরিল।

ডেপুটি বাবু জয়গোপালকে চিনিতেন। ভদ্রঘরের স্ত্রী ঘরের বাহির হইয়া বিষয় সম্পত্তি লইয়া স্বামীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে চাহে ইহাতে শশির প্রতি তিনি বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ জয়গোপালকে পত্র লিখিলেন। জয়গোপাল শ্যালকসহ তাহার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক নৌকায় তুলিয়া বাড়ি লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল।

স্বামী স্ত্রীতে, দ্বিতীয় বিচ্ছেদের পর, পুনশ্চ এই দ্বিতীয় বার মিলন হইল! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

অনেক দিন পরে ঘরে ফিরিয়া পুরাতন সহচরদিগকে পাইয়া নীলমণি বড় আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সেই নিশ্চিন্ত আনন্দ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে শশির হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শীতকালে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব মফঃস্বল পর্য্যবেক্ষণে বাহির হইয়া শীকার সন্ধানে গ্রামের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়াছেন। গ্রামের পথে সাহেবের সঙ্গে নীলমণির সাক্ষাৎ হয়। অন্য বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চাণক্য শ্লোকের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নখী দন্তী শৃঙ্গী প্রভৃতির সহিত সাহেবকেও যোগ করিয়া যথেষ্ট দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু সুগম্ভীরপ্রকৃতি নীলমণি অটল কৌতূহলের সহিত প্রশান্তভাবে সাহেবকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

সাহেব সকৌতুকে কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি পাঠশালায় পড়?—

বালক নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কোন পুস্তক পড়িয়া থাক?—

নীলমণি পুস্তক শব্দের অর্থ না বুঝিয়া নিস্তব্ধভাবে ম্যাজি-ষ্ট্রেটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যাজিষ্টর সাহেবের সহিত এই পরিচয়ের কথা নীলমণি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার দিদির নিকট বর্ণনা করিল।

মধ্যাহ্নে চাপকান প্যাণ্ট্‌লুন পাগ্‌ড়ি পরিয়া জয়গোপাল ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে সেলাম করিতে গিয়াছে। অর্থী প্রত্যর্থী চাপ্‌রাশী কন্‌ষ্টেব্‌লে চারিদিক লোকারণ্য। সাহেব গরমের ভয়ে তাম্বুর বাহিরে খোলা ছায়ায় ক্যাম্পটেবিল পাতিয়া বসিয়াছেন এবং জয়গোপালকে চৌকিতে বসাইয়া তাহাকে স্থানীয় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। জয়গোপাল তাহার গ্রামবাসী সর্ব্ব-সাধারণের সমক্ষে এই গৌরবের আসন অধিকার করিয়া মনে মনে স্ফীত হইতেছিল, এবং মনে করিতেছিল এই সময়ে চক্র-বর্ত্তীরা এবং নন্দীরা কেহ আসিয়া দেখিয়া যায় ত বেশ হয়!

এমন সময় নীলমণিকে সঙ্গে করিয়া অবগুণ্ঠনাবৃত একটি স্ত্রীলোক একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, সাহেব, তোমার হাতে আমার এই অনাথ ভাইটিকে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে রক্ষা কর!

সাহেব তাঁহার সেই পূর্ব্বপরিচিত বৃহৎমস্তক গম্ভীরপ্রকৃতি বালকটিকে দেখিয়া এবং স্ত্রীলোকটিকে ভদ্রস্ত্রীলোক বলিয়া অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কহিলেন, আপনি তাঁবুতে প্রবেশ করুন।

স্ত্রীলোকটি কহিল, আমার যাহা বলিবার আছে আমি এই-খানেই বলিব।

জয়গোপাল বিবর্ণমুখে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কৌতূহলী গ্রামের লোকেরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়া চারিদিকে ঘেঁষিয়া আসিবার উপক্রম করিল। সাহেব বেত উঁচাইবামাত্র সকলে দৌড় দিল।

তখন শশি তাহার ভ্রাতার হাত ধরিয়া সেই পিতৃমাতৃ-হীন বালকের সমস্ত ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল। জয়-গোপাল মধ্যে মধ্যে বাধা দিবার উপক্রম করাতে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ রক্তবর্ণ মুখে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—চুপ্‌ রও! এবং বেত্রাগ্র দ্বারা, তাহাকে চৌকি ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইতে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

জয়গোপাল মনে মনে শশির প্রতি গর্জ্জন করিতে করিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীলমণি দিদির অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া অবাক্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

শশির কথা শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ জয়গোপালকে গুটি-কতক প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার উত্তর শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন—বাছা, এ মকর্দ্দমা যদিও আমার কাছে উঠিতে পারে না তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত থাক—এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য আমি করিব। তুমি তোমার ভাইটিকে লইয়া নির্ভয়ে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পার!

শশি কহিল—সাহেব, যতদিন নিজের বাড়ি ও না ফিরিয়া

পায় ততদিন আমার ভাইকে বাড়ি লইয়া যাইতে আমি সাহস করি না। এখন নীলমণিকে তুমি নিজের কাছে না রাখিলে ইহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

সাহেব কহিলেন, তুমি কোথায় যাইবে।

শশি কহিল, আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইব, আমার কোন ভাবনা নাই।

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া অগত্যা এই গলায় মাদুলি পরা কৃশকায় শ্যামবর্ণ গম্ভীর প্রশান্ত মৃদুস্বভাব বাঙ্গালীর ছেলেটিকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন।

তখন শশি বিদায় লইবার সময় বালক তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সাহেব কহিলেন, বাবা তোমার কোন ভয় নেই—এস!

ঘোমটার মধ্য হইতে অবিরল অশ্রু মোচন করিতে করিতে শশি কহিল—লক্ষ্মী ভাই, যা ভাই—আবার তোর দিদির সঙ্গে দেখা হবে!

এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া কোন মতে আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল; অমনি সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, সে দিদিগো দিদি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল;—শশি একবার ফিরিয়া চাহিয়া দূর হইতে প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চিরপরিচিত পুরাতন ঘরে স্বামী স্ত্রীর মিলন হইল। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

কিন্তু এ মিলন অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশি ওলাউঠো রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে—এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

কেহ এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না। কেবল সেই প্রতিবেশিনী তারা মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিয়া উঠিতে চাহিত, সকলে চুপ্ চুপ্ করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিত।

বিদায়কালে শশি ভাইকে কথা দিয়া গিয়াছিল আবার দেখা হইবে—সে কথা কোন্‌খানে রক্ষা হইয়াছে জানি না।

মানভঞ্জন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রমানাথ শীলের ত্রিতল অট্টালিকায় সর্ব্বোচ্চ তলের ঘরে গোপী-নাথ শীলের স্ত্রী গিরিবালা বাস করেন। শয়নকক্ষের দক্ষিণ দ্বারের সম্মুখে ফুলের টবে গুটিকতক বেলফুল এবং গোলাপ-ফুলের গাছ;—ছাতটি উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা—বহির্দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ইট ফাঁক দেওয়া আছে। শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতী নারীমূর্ত্তির বাঁধানো এন্‌গ্রেভিং টাঙ্গানো রহিয়াছে; কিন্তু প্রবেশদ্বারের সম্মুখবর্ত্তী বৃহৎ আয়নার উপরে ষোড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিম্বটি পড়ে, তাহা দেয়ালের কোন ছবি অপেক্ষা সৌন্দর্য্যে ন্যূন নহে।

গিরিবালার সৌন্দর্য্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে চেতনার ন্যায় একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয় ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চারিদিকে এবং চিরকাল যেরূপ দেখিয়া আসিতেছি, এ একেবারে হঠাৎ তাহা হইতে অনেক স্বতন্ত্র।

গিরিবালাও আপন লাবণ্যোচ্ছ্বাসে আপনি আদ্যোপান্ত

তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নবযৌবন এবং নবীন সৌন্দর্য্য তাহার সর্ব্বাঙ্গে তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে,—তাহার বসনে ভূষণে গমনে, তাহার বাহুর বিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভঙ্গীতে, তাহার চঞ্চল চরণের উদ্দাম ছন্দে, নূপুরনিক্কণে, কঙ্কণের কিঙ্কিণীতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্রভাষায়, উজ্জ্বল কটাক্ষে একেবারে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

আপন সর্ব্বাঙ্গের এই উচ্ছলিত মদিররসে গিরিবালার একটা নেশা লাগিয়াছে। প্রায় দেখা যাইত, একখানি কোমল রঙীন্ বস্ত্রে আপনার পরিপূর্ণ দেহখানি জড়াইয়া সে ছাতের উপরে অকারণে চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে। যেন মনের ভিতরকার কোন এক অশ্রুত অব্যক্ত সঙ্গীতের তালে তালে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নৃত্য করিতে চাহিতেছে। আপনার অঙ্গকে নানা ভঙ্গীতে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহার যেন বিশেষ কি এক আনন্দ আছে;—সে যেন আপন সৌন্দর্য্যের নানা দিকে নানা ঢেউ তুলিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গের উত্তপ্ত রক্তস্রোতে অপূর্ব্ব পুলক সহকারে বিচিত্র আঘাত প্রতিঘাত অনুভব করিতে থাকে। সে হঠাৎ গাছ হইতে পাতা ছিঁড়িয়া দক্ষিণ বাহু আকাশে তুলিয়া সেটা বাতাসে উড়াইয়া দেয়—অমনি তাহার বালা বাজিয়া উঠে, তাহার অঞ্চল বিস্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহার সুললিত বাহুর ভঙ্গীটি পিঞ্জরমুক্ত অদৃশ্য পাখীর মত অনন্ত আকাশে মেঘরাজ্যের

অভিমুখে উড়িয়া চলিয়া যায়। হঠাৎ সে টব হইতে একটা মাটির ঢেলা তুলিয়া অকারণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়; চরণাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বৃহৎ বহির্জ্জগৎটা একবার চট্‌ করিয়া দেখিয়া লয়—আবার ঘুরিয়া আঁচল ঘুরাইয়া চলিয়া আসে, আঁচলের চাবির গোচ্ছা ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠে। হয় ত আয়নার সম্মুখে গিয়া খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া অসময়ে চুল বাঁধিতে বসে; চুল বাঁধিবার দড়ি দিয়া কেশমূল বেষ্টন করিয়া সেই দড়ি কুন্দদন্তপংক্তিতে দংশন করিয়া ধরে, দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া মস্তকের পশ্চাতে বেণীগুলিকে দৃঢ় আকর্ষণে কুণ্ডলায়িত করে—চুল বাঁধা শেষ করিয়া হাতের সমস্ত কাজ ফুরাইয়া যায়—তখন সে আলস্যভরে কোমল বিছানার উপরে আপনাকে পত্রান্তরালচ্যুত একটি জ্যোৎস্নালেখার মত বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়।

তাহার সন্তানাদি নাই, ধনিগৃহে তাহার কোন কাজকর্ম্মও নাই—সে কেবল নির্জ্জনে প্রতিদিন আপনার মধ্যে আপনি সঞ্চিত হইয়া শেষকালে আপনাকে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। স্বামী আছে কিন্তু তাহার আয়ত্তের মধ্যে নাই। গিরিবালা বাল্যকাল হইতে যৌবনে এমন পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিয়াও কেমন করিয়া তাহার স্বামীর চক্ষু এড়াইয়া গেছে।

বরঞ্চ বাল্যকালে সে তাহার স্বামীর আদর পাইয়াছিল। স্বামী তখন ইস্কুল পালাইয়া তাহার সুপ্ত অভিভাবকদিগকে

বঞ্চনা করিয়া নির্জ্জন মধ্যাহ্নে তাহার বালিকা স্ত্রীর সহিত প্রণয়ালাপ করিতে আসিত। এক বাড়িতে থাকিয়াও সৌখীন চিঠির কাগজে স্ত্রীর সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করিত। ইস্কু-লের বিশেষ বন্ধুদিগকে সেই সমস্ত চিঠি দেখাইয়া গর্ব্ব অনুভব করিত। তুচ্ছ এবং কল্পিত কারণে স্ত্রীর সহিত মান অভিমানেরও অসদ্ভাব ছিল না।

এমন সময়ে বাপের মৃত্যুতে গোপীনাথ স্বয়ং বাড়ির কর্ত্তা হইয়া উঠিল। কাঁচা কাঠের তক্তায় শীঘ্র পোকা ধরে—কাঁচা বয়সে গোপীনাথ যখন স্বাধীন হইয়া উঠিল তখন অনেকগুলি জীবজন্তু তাহার স্কন্ধে বাসা করিল। তখন ক্রমে অন্তঃপুরে তাহার গতিবিধি হ্রাস হইয়া অন্যত্র প্রসারিত হইতে লাগিল।

দলপতিত্বের একটা উত্তেজনা আছে; মানুষের কাছে মানুষের নেশাটা অত্যন্ত বেশী। অসংখ্য মনুষ্যজীবন এবং সুবিস্তীর্ণ ইতিহাসের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিবার প্রতি নেপোলিয়নের যে একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল—একটি ছোট বৈঠকখানার ছোট কর্ত্তাটিরও নিজের ক্ষুদ্র দলের নেশা অল্পতর পরিমাণে সেই এক জাতীয়। সামান্য ইয়ার্কিবন্ধনে আপনার চারিদিকে একটা লক্ষ্মীছাড়া ইয়ারমণ্ডলী সৃজন করিয়া তুলিলে তাহাদের উপর আধিপত্য এবং তাহাদের নিকট হইতে বাহবা লাভ করা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়; সে জন্য অনেক লোক বিষয়-নাশ, ঋণ, কলঙ্ক সমস্তই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়।

গোপীনাথ তাহার ইয়ার-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া ভারি মাতিয়া উঠিল। সে প্রতিদিন ইয়ার্কির নব নব কীর্ত্তি নব নব গৌরব লাভ করিতে লাগিল। তাহার দলের লোক বলিতে লাগিল—শ্যালকবর্গের মধ্যে ইয়ার্কিতে অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিল গোপীনাথ; সেই গর্ব্বে সেই উত্তেজনায় অন্যান্য সমস্ত সুখদুঃখকর্ত্তব্যের প্রতি অন্ধ হইয়া হতভাগ্য ব্যক্তিটি রাত্রি-দিন আবর্ত্তের মত পাক খাইয়া খাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

এদিকে জগজ্জয়ী রূপ লইয়া আপন অন্তঃপুরের প্রজাহীন রাজ্যে, শয়ন-গৃহের শূন্য সিংহাসনে গিরিবালা অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। সে নিজে জানিত বিধাতা তাহার হস্তে রাজদণ্ড দিয়াছেন—সে জানিত, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া যে বৃহৎ জগৎ-খানি দেখা যাইতেছে, সেই জগৎটিকে সে কটাক্ষে জয় করিয়া আসিতে পারে—অথচ বিশ্বসংসারের মধ্যে একটি মানুষকেও সে বন্দী করিতে পারে নাই।

গিরিবালার একটি সুরসিকা দাসী আছে, তাহার নাম সুধো, অর্থাৎ সুধামুখী। সে গান গাহিত, নাচিত, ছড়া কাটিত, প্রভুপত্নীর রূপের ব্যাখ্যা করিত, এবং অরসিকের হস্তে এমন রূপ নিষ্ফল হইল বলিয়া আক্ষেপ করিত। গিরি-বালার যখন তখন এই সুধাকে নহিলে চলিত না। উল্টিয়া পাল্টিয়া সে নিজের মুখের শ্রী, দেহের গঠন, বর্ণের উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা শুনিত; মাঝে মাঝে তাহার প্রতিবাদ করিত, এবং পরম পুলকিত চিত্তে সুধোকে মিথ্যা-

বাদিনী চাটুভাষিণী বলিয়া গঞ্জনা করিতে ছাড়িত না;—সুধো তখন শত শত শপথ সহকারে নিজের মতের অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিতে বসিত, গিরিবালার পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা নিতান্ত কঠিন হইত না।

সুধো গিরিবালাকে গান শুনাইত—"দাসখত দিলাম লিখে শ্রীচরণে";—এই গানের মধ্যে গিরিবালা নিজের অলক্তাঙ্কিত অনিন্দ্য সুন্দর চরণপল্লবের স্তব শুনিতে পাইত এবং একটি পদলুণ্ঠিত দাসের ছবি তাহার কল্পনায় উদিত হইত—কিন্তু হায়, দুটি শ্রীচরণ মলের শব্দে শূন্য ছাতের উপরে আপন জয়-গান ঝঙ্কৃত করিয়া বেড়ায়, তবু কোন স্বেচ্ছাবিক্রীত ভক্ত আসিয়া দাসখৎ লিখিয়া দিয়া যায় না।

গোপীনাথ যাহাকে দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছে, তাহার নাম লবঙ্গ,—সে থিয়েটারে অভিনয় করে—সে ষ্টেজের উপরে চমৎকার মূর্চ্ছা যাইতে পারে—সে যখন সানুনাসিক কৃত্রিম কাঁদুনীর স্বরে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া টানিয়া টানিয়া আধ-আধ উচ্চারণে "প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর" করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে, তখন পাৎলা ধুতির উপর ওয়েষ্টকোট্-পরা, ফুল্‌মোজামণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী "এক্সেলেণ্ট্" "এক্সেলেণ্ট্" করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এই অভিনেত্রী লবঙ্গের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার বর্ণনা গিরি-বালা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তাহার স্বামীর মুখেই শুনিয়াছে। তখনও তাহার স্বামী সম্পূর্ণ রূপে পলাতক হয় নাই। তখন

সে তাহার স্বামীর মোহাবস্থা না জানিয়াও মনে মনে অসূয়া অনুভব করিত। আর কোন নারীর এমন কোন মনোরঞ্জনী বিদ্যা আছে যাহা তাহার নাই ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। সাসূয় কৌতূহলে সে অনেকবার থিয়েটার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মত করিতে পারিত না।

অবশেষে সে একদিন টাকা দিয়া সুধোকে থিয়েটার দেখিতে পাঠাইয়া দিল;—সুধো আসিয়া নাসাভ্র কুঞ্চিত করিয়া রামনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অভিনেত্রীদিগের ললাটদেশে সম্মার্জ্জনীর ব্যবস্থা করিল—এবং তাহাদের কদর্য্যমূর্ত্তি ও কৃত্রিম ভঙ্গীতে যে সমস্ত পুরুষের অভিরুচি জন্মে তাহাদের সম্বন্ধেও সেই একই রূপ বিধান স্থির করিল। শুনিয়া গিরি-বালা বিশেষ আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু যখন তাহার স্বামী বন্ধন ছিন্ন করিয়া গেল, তখন তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল। সুধোর কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে সুধো গিরির গা ছুঁইয়া বারম্বার কহিল, বস্ত্র-খণ্ডাবৃত দগ্ধকাষ্ঠের মত তাহার নীরস এবং কুৎসিত চেহারা। গিরি তাহার আকর্ষণীশক্তির কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না, এবং নিজের অভিমানে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুধোকে লইয়া গোপনে থিয়েটার দেখিতে গেল। নিষিদ্ধ কাজের উত্তেজনা বেশী।

তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে এক মৃদু কম্পন উপস্থিত হইয়াছিল সেই কম্পনাবেগে এই আলোকময়, লোকময়, বাদ্যসঙ্গীত-মুখরিত, দৃশ্যপট-শোভিত রঙ্গভূমি তাহার চক্ষে দ্বিগুণ অপরূপতা ধারণ করিল। তাহার সেই প্রাচীরবেষ্টিত নির্জ্জন নিরানন্দ অন্তঃপুর হইতে এ কোন্ এক সুসজ্জিত সুন্দর উৎসবলোকের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল! সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সে দিন মানভঞ্জন অপেরা অভিনয় হইতেছে। যখন ঘণ্টা বাজিল, বাদ্য থামিয়া গেল, চঞ্চল দর্শকগণ মুহূর্ত্তে স্থির নিস্তব্ধ হইয়া বসিল, রঙ্গমঞ্চের সম্মুখবর্ত্তী আলোকমালা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, পট উঠিয়া গেল, একদল সুসজ্জিত নটী ব্রজাঙ্গনা সাজিয়া সঙ্গীত-সহযোগে নৃত্য করিতে লাগিল, দর্শকগণের করতালি ও প্রশংসাবাদে নাট্যশালা থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত কম্পিত হইয়া উঠিল, তখন গিরিবালার তরুণ দেহের রক্ত লহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গীতের তানে, আলোক ও আভরণের ছটায়, এবং সম্মিলিত প্রশংসাধ্বনিতে সে ক্ষণকালের জন্য সমাজ সংসার সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেল—মনে করিল, এমন এক জায়গায় আসিয়াছে যেখানে বন্ধনমুক্ত সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্বাধীনতার কোন বাধামাত্র নাই।

সুধো মাঝে মাঝে আসিয়া ভীতস্বরে কানে কানে বলে, বৌঠাকুরুণ, এই বেলা বাড়ি ফিরিয়া চল; দাদাবাবু জানিতে

পারিলে রক্ষা থাকিবে না। গিরিবালা সে কথায় কর্ণপাত করে না। তাহার মনে এখন আর কিছুমাত্র ভয় নাই।

অভিনয় অনেক দূর অগ্রসর হইল। রাধার দুর্জ্জয় মান হইয়াছে;—সে মানসাগরে কৃষ্ণ আর কিছুতেই থই পাইতেছে না;—কত অনুনয় বিনয় সাধাসাধি কাঁদাকাঁদি—কিছুতেই কিছু হয় না! তখন গর্ব্বভরে গিরিবালার বক্ষ ফুলিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই লাঞ্ছনায় সে যেন মনে মনে রাধা হইয়া নিজের অসীম প্রতাপ নিজে অনুভব করিতে লাগিল। কেহ তাহাকে কখন এমন করিয়া সাধে নাই; সে অবহেলিত অবমানিত পরিত্যক্ত স্ত্রী, কিন্তু তবু সে এক অপূর্ব্ব মোহে স্থির করিল যে, এমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে কাঁদাইবার ক্ষমতা তাহারও আছে। সৌন্দর্য্যের যে কেমন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ তাহা সে কানে শুনিয়াছে অনুমান করিয়াছে মাত্র—আজ দীপের আলোকে, গানের সুরে, সুদৃশ্য রঙ্গমঞ্চের উপরে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিল। নেশায় তাহার সমস্ত মস্তিষ্ক ভরিয়া উঠিল।

অবশেষে যবনিকা পতন হইল, গ্যাসের আলো ম্লান হইয়া আসিল, দর্শকগণ প্রস্থানের উপক্রম করিল; গিরিবালা মন্ত্র-মুগ্ধের মত বসিয়া রহিল। এখান হইতে উঠিয়া যে বাড়ি যাইতে হইবে একথা তাহার মনে ছিল না। সে ভাবিতেছিল, অভিনয় বুঝি ফুরাইবে না, যবনিকা আবার উঠিবে, রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরাভব, জগতে ইহা ছাড়া আর কোন বিষয় উপ-

স্থিত নাই। সুধো কহিল, বৌঠাকুরুণ, কর কি, ওঠ, এখনি সমস্ত আলো নিবাইয়া দিবে।

গিরিবালা গভীর রাত্রে আপন শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। কোণে একটি দীপ মিট্‌মিট্‌ করিতেছে—ঘরে একটি লোক নাই, শব্দ নাই—গৃহপ্রান্তে নির্জ্জন শয্যার উপরে একটি পুরাতন মশারি বাতাসে অল্প অল্প দুলিতেছে; তাহার প্রতিদিনের জগৎ অত্যন্ত বিশ্রী বিরস এবং তুচ্ছ বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। কোথায় সেই সৌন্দর্য্যময় আলোকময় সঙ্গীতময় রাজ্য যেখানে সে আপনার সমস্ত মহিমা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া জগতের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতে পারে—যেখানে সে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তুচ্ছ সাধারণ নারীমাত্র নহে!

এখন হইতে সে প্রতি সপ্তাহেই থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিল! কালক্রমে তাহার সেই প্রথম মোহ অনেকটা পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিল—এখন সে নটনটীদের মুখের রং চং, সৌন্দর্য্যের অভাব, অভিনয়ের কৃত্রিমতা সমস্ত দেখিতে পাইল, কিন্তু তবু তাহার নেশা ছুটিল না। রণসঙ্গীত শুনিলে যোদ্ধার হৃদয় যেমন নাচিয়া উঠে, রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়া গেলেই তাহার বক্ষের মধ্যে সেইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইত। ঐ যে, সমস্ত সংসার হইতে স্বতন্ত্র সুদৃশ্য সমুচ্চ সুন্দর বেদিকা, স্বর্ণলেখায় অঙ্কিত, চিত্রপটে সজ্জিত, কাব্য এবং সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে মায়ামণ্ডিত, অসংখ্য মুগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত, নেপথ্যভূমির গোপনতার দ্বারা অপূর্ব্ব রহস্যপ্রাপ্ত, উজ্জ্বল আলোকমালায়

সর্ব্বসমক্ষে সুপ্রকাশিত,—বিশ্ববিজয়িনী সৌন্দর্য্যরাজ্ঞীর পক্ষে এমন মায়া-সিংহাসন আর কোথায় আছে?

প্রথমে যে দিন সে তাহার স্বামীকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত দেখিল, এবং যখন গোপীনাথ কোন নটীর অভিনয়ে উন্মত্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন স্বামীর প্রতি তাহার মনে প্রবল অবজ্ঞার উদয় হইল। সে জর্জ্জরিত চিত্তে মনে করিল যদি কখন এমন দিন আসে যে, তাহার স্বামী তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের মত তাহার পদতলে আসিয়া পড়ে, এবং সে আপন চরণনখরের প্রান্ত হইতে উপেক্ষা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া অভিমানভরে চলিয়া যাইতে পারে তবেই তাহার এই ব্যর্থ রূপ ব্যর্থ যৌবন সার্থকতা লাভ করিবে।

কিন্তু সে শুভদিন আসিল কই? আজ কাল গোপীনাথের দর্শন পাওয়াই দুর্লভ হইয়াছে। সে আপন প্রমত্ততার ঝড়ের মুখে ধূলিধ্বজের মত একটা দল পাকাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার আর ঠিকানা নাই।

একদিন চৈত্রমাসের বাসন্তী পূর্ণিমায় গিরিবালা বসন্তী-রঙ্গের কাপড় পরিয়া দক্ষিণ বাতাসে অঞ্চল উড়াইয়া ছাতের উপর বসিয়াছিল। যদিও ঘরে স্বামী আসে না তবু গিরি উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া প্রতিদিন বদল করিয়া নূতন নূতন গহনায় আপনাকে সুসজ্জিত করিয়া তুলিত। হীরামুকুতার আভরণ তাহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে একটি উন্মাদনা সঞ্চার করিত, ঝল্‌মল্‌

করিয়া রুনুঝুনু বাজিয়া তাহার চারিদিকে একটি হিল্লোল তুলিতে থাকিত। আজ সে হাতে বাজুবন্ধ এবং গলায় একটি চুণী ও মুক্তার কণ্ঠী পরিয়াছে এবং বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে। সুধো পায়ের কাছে বসিয়া মাঝে মাঝে তাহার নিটোলকোমল রক্তোৎপল পদপল্লবে হাত বুলাইতেছিল—এবং অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতেছিল, আহা বৌঠাকরুণ আমি যদি পুরুষ মানুষ হইতাম তাহা হইলে এই পা দুখানি বুকে লইয়া মরিতাম। গিরিবালা সগর্ব্বে হাসিয়া উত্তর দিতেছিল, বোধ করি বুকে না লইয়াই মরিতে হইত—তখন কি আর এমন করিয়া পা ছড়াইয়া দিতাম? আর বকিস্‌নে; তুই সেই গানটা গা!

সুধো সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জ্জন ছাদের উপর গাহিতে লাগিল—

দাসখৎ দিলেম লিখে শ্রীচরণে,
সকলে সাক্ষী থাকুক্ বৃন্দাবনে।

তখন রাত্রি দশটা। বাড়ির আর সকলে আহারাদি সমাধা করিয়া ঘুমাইতে গিয়াছে। এমন সময় আতর মাখিয়া উড়ানী উড়াইয়া হঠাৎ গোপীনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল,—সুধো অনেক খানি জিব কাটিয়া সাত হাত ঘোম্‌টা টানিয়া ঊর্দ্ধ-শ্বাসে পলায়ন করিল।

গিরিবালা ভাবিল আজ তাহার দিন আসিয়াছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। সে রাধিকার মত গুরুমানভরে অটল

হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু দৃশ্যপট উঠিল না—শিখিপুচ্ছচূড়া পায়ের কাছে লুটাইল না—কেহ কাফি রাগিণীতে গাহিয়া উঠিল না—

কেন, পূর্ণিমা আঁধার কর লুকায়ে বদন-শশি!

সঙ্গীতহীন নীরসকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল—একবার চাবিটা দাও দেখি!

এমন জ্যোৎস্নায় এমন বসন্তে এতদিনের বিচ্ছেদের পরে এই কি প্রথম সম্ভাষণ! কাব্যে নাটকে উপন্যাসে যাহা লেখে তাহার আগাগোড়াই মিথ্যা কথা! অভিনয়মঞ্চেই প্রণয়ী গান গাহিয়া পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে—এবং তাহাই দেখিয়া যে দর্শকের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়, সেই লোকটি বসন্তনিশীথে গৃহছাদে আসিয়া আপন অনুপমা যুবতী স্ত্রীকে বলে, ওগো একবার চাবিটা দাও দেখি! তাহাতে না আছে রাগিণী না আছে প্রীতি, তাহাতে কোন মোহ নাই, মাধুর্য্য নাই, তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর!

এমন সময়ে দক্ষিণে বাতাস জগতের সমস্ত অপমানিত কবিত্বের মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিশ্বাসের মত হুহু করিয়া বহিয়া গেল—টবভরা ফুটন্ত বেলফুলের গন্ধ ছাদময় ছড়াইয়া দিয়া গেল—গিরিবালার চূর্ণ অলক চোখে মুখে আসিয়া পড়িল এবং তাহার বসন্তীরঙের সুগন্ধি আঁচল অধীরভাবে যেখানে সেখানে উড়িতে লাগিল। গিরিবালা সমস্ত মান বিসর্জ্জন দিয়া উঠিয়া পড়িল।

স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, চাবী দিব এখন তুমি ঘরে চল। —আজ সে কাঁদিবে কাঁদাইবে, তাহার সমস্ত নির্জ্জন কল্পনাকে সার্থক করিবে, তাহার সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিয়া বিজয়ী হইবে, ইহা সে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছে।

গোপীনাথ কহিল, আমি বেশি দেরী করিতে পারিব না —তুমি চাবি দাও।

গিরিবালা কহিল—আমি চাবি দিব এবং চাবির মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্ত দিব—কিন্তু আজ রাত্রে তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না।

গোপীনাথ বলিল—সে হইবে না। আমার বিশেষ দরকার আছে।

গিরিবালা বলিল—তবে আমি চাবি দিব না!

গোপী বলিল, দিবে না বৈ কি? কেমন না দাও দেখিব! বলিয়া সে গিরিবালার আঁচলে দেখিল চাবি নাই। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার আয়নার বাক্সর দেরাজ খুলিয়া দেখিল তাহার মধ্যেও চাবি নাই। তাহার চুল বাঁধিবার বাক্স জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া খুলিল—তাহাতে কাজললতা, সিঁদুরের কৌটা, চুলের দড়ি প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণ আছে—চাবি নাই। তখন সে বিছানা ঘাঁটিয়া গদি উঠাইয়া আল্‌মারি ভাঙ্গিয়া নাস্তানাবুদ্‌ করিয়া তুলিল।

গিরিবালা প্রস্তরমূর্ত্তির মত শক্ত হইয়া দরজা ধরিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যর্থমনোরথ গোপীনাথ রাগে

গর্‌গর্‌ করিতে করিতে আসিয়া বলিল—চাবি দাও বলিতেছি নহিলে ভাল হইবে না।

গিরিবালা উত্তরমাত্র দিল না। তখন গোপী তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার হাত হইতে বাজুবন্ধ, গলা হইতে কণ্ঠী, অঙ্গুলি হইতে আংটি ছিনিয়া লইয়া তাহাকে লাথি মারিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ির কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল না, পল্লীর কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, জ্যোৎস্নারাত্রি তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, সর্ব্বত্র যেন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু অন্তরের চীৎকারধ্বনি যদি বাহিরে শুনা যাইত তবে সেই চৈত্র মাসের সুখসুপ্ত জ্যোৎস্নানিশীথিনী অকস্মাৎ তীব্রতম আর্ত্ত-স্বরে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এমন সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এমন হৃদয়-বিদারণ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে!

অথচ সে রাত্রিও কাটিয়া গেল। এমন পরাভব এত অপ-মান গিরিবালা সুধোর কাছেও বলিতে পারিল না। মনে করিল, আত্মহত্যা করিয়া, এই অতুল রূপ যৌবন নিজের হাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে আপন অনাদরের প্রতিশোধ লইবে। কিন্তু তখনি মনে পড়িল, তাহাতে কাহারও কিছু আসিবে যাইবে না—পৃথিবীর যে কতখানি ক্ষতি হইবে তাহা কেহ অনুভবও করিবে না। জীবনেও কোন সুখ নাই, মৃত্যুতেও কোন সান্ত্বনা নাই।

গিরিবালা বলিল, আমি বাপের বাড়ি চলিলাম।—তাহার

বাপের বাড়ি কলিকাতা হইতে দূরে। সকলেই নিষেধ করিল —কিন্তু বাড়ির কর্ত্রী নিষেধও শুনিল না কাহাকে সঙ্গেও লইল না। এদিকে গোপীনাথও সদলবলে নৌকাবিহারে কত দিনের জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গান্ধর্ব্ব থিয়েটারে গোপীনাথ প্রায় প্রত্যেক অভিনয়েই উপস্থিত থাকিত। সেখানে মনোরমানাটকে লবঙ্গ মনোরমা সাজিত এবং গোপীনাথ সদলে সম্মুখের সারে বসিয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে বাহাবা দিত এবং ষ্টেজের উপর তোড়া ছুঁড়িয়া ফেলিত। মাঝে মাঝে এক এক দিন গোলমাল করিয়া দর্শকদের অত্যন্ত বিরক্তিভাজন হইত। তথাপি রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ তাহাকে কখন নিষেধ করিতে সাহস করে নাই।

অবশেষে একদিন গোপীনাথ কিঞ্চিৎ মত্তাবস্থায় গ্রীন্‌রুমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভারি গোল বাধাইয়া দিল। কি এক সামান্য কাল্পনিক কারণে সে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কোনও নটীকে গুরুতর প্রহার করিল—তাহার চীৎকারে, এবং গোপীনাথের গালিবর্ষণে সমস্ত নাট্যশালা চকিত হইয়া উঠিল।

সেদিন অধ্যক্ষগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া গোপীনাথকে পুলিসের সাহায্যে বাহির করিয়া দেয়।

গোপীনাথ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৃতনিশ্চয় হইল। থিয়েটারওয়ালারা পূজার একমাস পূর্ব্ব হইতে নূতন নাটক মনোরমার অভিনয় খুব আড়ম্বরসহকারে ঘোষণা করিয়াছে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা কলিকাতা সহরটাকে কাগজে মুড়িয়া ফেলিয়াছে;—রাজধানীকে যেন সেই বিখ্যাত গ্রন্থকারের নামাঙ্কিত নামাবলী পরাইয়া দিয়াছে।

এমন সময় গোপীনাথ তাহাদের প্রধান অভিনেত্রী লবঙ্গকে লইয়া বোটে চড়িয়া কোথায় অন্তর্দ্ধান হইল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

থিয়েটারওয়ালারা হঠাৎ অকূলপাথারে পড়িয়া গেল। কিছু দিন লবঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিয়া অবশেষে এক নূতন অভিনেত্রীকে মনোরমার অংশ অভ্যাস করাইয়া লইল—তাহাতে তাহাদের অভিনয়ের সময় পিছাইয়া গেল।

কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হইল না। অভিনয়স্থলে দর্শক আর ধরে না। শত শত লোক দ্বার হইতে ফিরিয়া যায়। কাগজেও প্রশংসার সীমা নাই।

সে প্রশংসা দূরদেশে গোপীনাথের কানে গেল। সে আর থাকিতে পারিল না। বিদ্বেষে এবং কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া সে অভিনয় দেখিতে আসিল।

প্রথম পট-উৎক্ষেপে অভিনয়ের আরম্ভভাগে মনোরমা দীনহীন বেশে দাসীর মত তাহার শ্বশুরবাড়িতে থাকে—প্রচ্ছন্ন বিনম্র সঙ্কুচিতভাবে সে আপনার কাজ কর্ম্ম করে—

তাহার মুখে কথা নাই, এবং তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখাই যায় না।

অভিনয়ের শেষাংশে মনোরমাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া তাহার স্বামী অর্থলোভে কোন এক লক্ষপতির একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিবাহের পর বাসরঘরে যখন স্বামী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল তখন দেখিতে পাইল—এও সেই মনোরমা,—কেবল সেই দাসীবেশ নাই—আজ সে রাজকন্যা সাজিয়াছে—তাহার নিরুপম সৌন্দর্য্য, আভরণে ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া দশদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। শিশু-কালে মনোরমা তাহার ধনী পিতৃগৃহ হইতে অপহৃত হইয়া দরিদ্রের গৃহে পালিত হইয়াছে। বহুকাল পরে সম্প্রতি তাহার পিতা সেই সন্ধান পাইয়া কন্যাকে ঘরে আনাইয়া তাহার স্বামীর সহিত পুনরায় নূতন সমারোহে বিবাহ দিয়াছে।

তাহার পরে বাসর-ঘরে মানভঞ্জনের পালা আরম্ভ হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ভারি এক গোলমাল বাধিয়া উঠিল। মনোরমা যতক্ষণ মলিন দাসীবেশে ঘোমটা টানিয়া ছিল ততক্ষণ গোপীনাথ নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতেছিল। কিন্তু যখন সে আভরণে ঝলমল করিয়া, রক্তাম্বর পরিয়া, মাথার ঘোমটা ঘুচাইয়া, রূপের তরঙ্গ তুলিয়া বাসর-ঘরে দাঁড়াইল এবং এক অনির্ব্বচনীয় গর্ব্বে গৌরবে গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী গোপীনাথের প্রতি চকিত বিদ্যুতের ন্যায় অবজ্ঞাবজ্রপূর্ণ তীক্ষ্ণ-

কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল—যখন সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া প্রশংসায় করতালিতে নাট্যস্থলী সুদীর্ঘকাল কম্পান্বিত করিয়া তুলিতে লাগিল—তখন গোপীনাথ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া গিরিবালা গিরিবালা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া ষ্টেজের উপর লাফ দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—বাদকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

এই অকস্মাৎ রসভঙ্গে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া দর্শকগণ, ইংরাজিতে বাঙ্গলায়, দূর করে দাও, বের করে দাও, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

গোপীনাথ পাগলের মত ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল, আমি ওকে খুন করব, ওকে খুন করব!

পুলিস আসিয়া গোপীনাথকে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। সমস্ত কলিকাতা সহরের দর্শক দুই চক্ষু ভরিয়া গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল—কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।

ঠাকুর্দ্দা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নয়নজোড়ের জমিদারেরা এককালে বাবু বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তখনকার কালের বাবুয়ানার আদর্শ বড় সহজ ছিল না। এখন যেমন রাজা রায়বাহাদুর খেতাব অর্জ্জন করিতে অনেককে খানা নাচ ঘোড়দৌড় এবং সেলাম সুপারিসের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তখনও সাধারণের নিকট হইতে বাবু উপাধি লাভ করিতে বিস্তর দুঃসাধ্য তপশ্চরণ করিতে হইত।

আমাদের নয়নজোড়ের বাবুরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঢাকাই কাপড় পরিতেন, কারণ পাড়ের কর্কশতায় তাঁহাদের সুকোমল বাবুয়ানা ব্যথিত হইত। তাঁহারা লক্ষ টাকা দিয়া বিড়ালশাবকের বিবাহ দিতেন এবং কথিত আছে, একবার কোন উৎসব উপলক্ষে রাত্রিকে দিন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অসংখ্য দীপ জ্বালাইয়া সূর্য্যকিরণের অনুকরণে তাঁহারা সাঁচ্চা রূপার জরি উপর হইতে বর্ষণ করাইয়াছিলেন।

ইহা হইতেই সকলে বুঝিবেন সেকালে বাবুদের বাবুয়ানা বংশানুক্রমে স্থায়ী হইতে পারিত না। বহু-বর্ত্তিকা-বিশিষ্ট প্রদীপের মত নিজের তৈল নিজে অল্পকালের ধূমধামেই নিঃশেষ করিয়া দিত।

আমাদের কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী সেই প্রখ্যাতযশ নয়নজোড়ের একটি নির্ব্বাপিত বাবু। ইনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৈল তখন প্রদীপের তলদেশে আসিয়া ঠেকিয়াছিল;—ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে পর নয়নজোড়ের বাবুয়ানা গোটাকতক অসাধারণ শ্রাদ্ধশান্তিতে অন্তিম দীপ্তি প্রকাশ করিয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। সমস্ত বিষয় আশয় ঋণের দায়ে বিক্রয় হইল—যে অল্প অবশিষ্ট রহিল তাহাতে পূর্ব্বপুরুষের খ্যাতি রক্ষা করা অসম্ভব।

সেই জন্য নয়নজোড় ত্যাগ করিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কৈলাস বাবু কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন—পুত্রটিও একটি কন্যামাত্র রাখিয়া এই হতগৌরব সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

আমরা তাঁহার কলিকাতার প্রতিবেশী। আমাদের ইতিহাসটা তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার পিতা নিজের চেষ্টায় ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; তিনি কখনও হাঁটুর নিম্নে কাপড় পরিতেন না, কড়াক্রান্তির হিসাব রাখিতেন, এবং বাবু উপাধি লাভের জন্য তাঁহার লালসা ছিল না। সে জন্য আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। আমি যে লেখা পড়া শিখিয়াছি এবং নিজের প্রাণ ও মান রক্ষার উপযোগী যথেষ্ট অর্থ বিনা চেষ্টায় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাই আমি পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি—শূন্য ভাণ্ডারে পৈতৃক বাবুয়ানার উজ্জ্বল ইতিহাসের অপেক্ষা লোহার

সিন্দুকের মধ্যে পৈতৃক কোম্পানির কাগজ আমার নিকট অনেক বেশী মূল্যবান বলিয়া মনে হয়।

বোধ করি সেই কারণেই, কৈলাসবাবু তাঁহাদের পূর্ব্ব-গৌরবের ফেল্-করা ব্যাঙ্কের উপর যখন দেদার লম্বাচৌড়া চেক্ চালাইতেন তখন তাহা আমার এত অসহ্য ঠেকিত। আমার মনে হইত, আমার পিতা স্বহস্তে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া কৈলাসবাবু বুঝি মনে মনে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা অনুভব করিতেছেন। আমি রাগ করিতাম এবং ভাবিতাম অবজ্ঞার যোগ্য কে? যে লোক সমস্ত জীবন কঠোর ত্যাগস্বীকার করিয়া, নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, লোকমুখের তুচ্ছ খ্যাতি অবহেলা করিয়া, অশ্রান্ত এবং সতর্ক বুদ্ধিকৌশলে সমস্ত প্রতিকূল বাধা প্রতিহত করিয়া সমস্ত অনুকূল অবসরগুলিকে আপনার আয়ত্তগত করিয়া একটি একটি রৌপ্যের স্তরে সম্পদের একটি সমুচ্চ পিরামিড্ একাকী স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি হাঁটুর নীচে কাপড় পরিতেন না বলিয়া যে কম লোক ছিলেন তাহা নয়!

তখন বয়স অল্প ছিল সেই জন্য এইরূপ তর্ক করিতাম রাগ করিতাম—এখন বয়স বেশী হইয়াছে এখন মনে করি, ক্ষতি কি! আমার ত বিপুল বিষয় আছে, আমার কিসের অভাব? যাহার কিছু নাই, সে যদি অহঙ্কার করিয়া সুখী হয়, তাহাতে আমার ত সিকি পয়সার লোকসান নাই, বরং সে বেচারার সান্ত্বনা আছে।

ইহাও দেখা গিয়াছে আমি ব্যতীত আর কেহ কৈলাস বাবুর উপর রাগ করিত না। কারণ, এত বড় নিরীহ লোক সচরাচর দেখা যায় না। ক্রিয়াকর্ম্মে সুখে দুঃখে প্রতিবেশীদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ যোগ ছিল। ছেলে হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলকেই দেখা হইবামাত্র তিনি হাসিমুখে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন—যেখানে যাহার যে কেহ আছে সকলেরই কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তবে তাঁহার শিষ্টতা বিরাম লাভ করিত। এই জন্য কাহারও সহিত তাঁহার দেখা হইলে একটা সুদীর্ঘ প্রশ্নোত্তরমালার সৃষ্টি হইত; ভাল ত? শশি ভাল আছে? আমাদের বড় বাবু ভাল আছেন? মধুর ছেলেটির জ্বর হয়েছিল শুনেছিলুম সে এখন ভাল আছে ত? হরিচরণ বাবুকে অনেককাল দেখিনি তাঁর অসুখ বিসুখ কিছু হয় নি? তোমাদের রাখালের খবর কি? বাড়ির এঁয়ারা সকলে ভাল আছেন? ইত্যাদি।

লোকটি ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাপড় চোপড় অধিক ছিল না, কিন্তু মেরজাইটি চাদরটি জামাটি, এমন কি, বিছানায় পাতিবার একটি পুরাতন র‍্যাপার, বালিশের ওয়াড়, একটি ক্ষুদ্র সতরঞ্চ সমস্ত স্বহস্তে রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া দড়িতে খাটাইয়া ভাঁজ করিয়া আলনায় তুলিয়া পরিপাটি করিয়া রাখিতেন। যখন তাঁহাকে দেখা যাইত তখনি মনে হইত যেন তিনি সুসজ্জিত প্রস্তুত হইয়া আছেন। অল্পস্বল্প সামান্য আস্‌বাবেও তাঁহার ঘরদ্বার সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিত। মনে হইত যেন তাঁহার আরও অনেক আছে।

ভৃত্যাভাবে অনেক সময় ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি নিজের হস্তে অতিশয় পরিপাটি করিয়া ধুতি কোঁচাইতেন এবং চাদর ও জামার আস্তিন বহুযত্নে ও পরিশ্রমে "গিলে" করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বড় বড় জমিদারী ও বহুমূল্যের বিষয়-সম্পত্তি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু একটি বহুমূল্য গোলাপপাশ, আতরদান, একটি সোনার রেকাবী, একটি রূপার আল্‌বোলা, একটি বহুমূল্য শাল ও সেকেলে জামাযোড়া ও পাগড়ী দারিদ্র্যের গ্রাস হইতে বহুচেষ্টায় তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। কোন একটা উপলক্ষ উপস্থিত হইলে এই গুলি বাহির হইত এবং নয়নজোড়ের জগদ্বিখ্যাত বাবুদের গৌরব রক্ষা হইত।

এদিকে কৈলাসবাবু মাটির মানুষ হইলেও কথায় যে অহঙ্কার করিতেন সেটা যেন পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কর্ত্তব্য বোধে করিতেন; সকল লোকেই তাহাতে প্রশ্রয় দিত এবং বিশেষ আমোদ বোধ করিত।

পাড়ার লোকে তাঁহাকে ঠাকুর্দ্দামশাই বলিত এবং তাঁহার ওখানে সর্ব্বদা বিস্তর লোক সমাগম হইত; কিন্তু দৈন্যাবস্থায় পাছে তাঁহার তামাকের খরচটা গুরুতর হইয়া উঠে এই জন্য প্রায়ই পাড়ার কেহ না কেহ দুই এক সের তামাক কিনিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিত, ঠাকুর্দ্দামশায় একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি, ভাল গয়ার তামাক পাওয়া গেছে।

ঠাকুর্দ্দামশায় দুই এক টান টানিয়া বলিতেন, বেশ ভাই, বেশ তামাক। অমনি সেই উপলক্ষে ষাট পঁয়ষট্টি টাকা ভরির

তামাকের গল্প পাড়িতেন; এবং জিজ্ঞাসা করিতেন সে তামাক কাহারও আস্বাদ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে কি না?

সকলেই জানিত যে যদি কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে নিশ্চয় চাবির সন্ধান পাওয়া যাইবে না অথবা অনেক অন্বেষণের পর প্রকাশ পাইবে যে পুরাতন ভৃত্য গণেশ বেটা কোথায় যে কি রাখে তাহার আর ঠিকানা নাই—গণেশও বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অপবাদ স্বীকার করিয়া লইবে। এই জন্য সকলেই একবাক্যে বলিত, ঠাকুর্দ্দামশায় কাজ নেই, সে তামাক আমাদের সহ্য হবে না, আমাদের এই ভাল।

শুনিয়া ঠাকুর্দ্দা দ্বিরুক্তি না করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেন। সকলে বিদায় লইবার কালে বৃদ্ধ হঠাৎ বলিয়া উঠিতেন, সে যেন হল, তোমরা কবে আমার এখানে খাবে বলদেখি ভাই?

অমনি সকলে বলিত, সে একটা দিন ঠিক করে দেখা যাবে।

ঠাকুর্দ্দা মহাশয় বলিতেন, সেই ভাল, একটু বৃষ্টি পড়ুক, ঠাণ্ডা হোক্, নইলে এ গরমে গুরু ভোজনটা কিছু নয়।

যখন বৃষ্টি পড়িত তখন ঠাকুর্দ্দাকে কেহ তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিত না—বরঞ্চ কথা উঠিলে সকলে বলিত, এই বৃষ্টি বাদলটা না ছাড়লে সুবিধে হচ্চে না। ক্ষুদ্র বাসাবাড়িতে বাস করাটা তাঁহার পক্ষে ভাল দেখাইতেছে না এবং কষ্টও হইতেছে এ কথা তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহার সমক্ষে স্বীকার করিত, অথচ কলিকাতায় কিনিবার উপযুক্ত

বাড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যে কত কঠিন, সে বিষয়েও কাহারও সন্দেহ ছিল না—এমন কি আজ ছয় সাত বৎসর সন্ধান করিয়া ভাড়া লইবার মত একটা বড় বাড়ি পাড়ার কেহ দেখিতে পাইল না—অবশেষে ঠাকুর্দ্দা মশাই বলিতেন, "তা হোক্ ভাই, তোমাদের কাছাকাছি আছি এই আমার সুখ, নয়নজোড়ে বড় বাড়ি ত পড়েই আছে কিন্তু সেখানে কি মন টেঁকে ?"

আমার বিশ্বাস, ঠাকুর্দ্দাও জানিতেন যে, সকলে তাঁহার অবস্থা জানে, এবং যখন তিনি ভূতপূর্ব্ব নয়নজোড়কে বর্ত্তমান বলিয়া ভান করিতেন এবং অন্য সকলেও তাহাতে যোগ দিত তখন তিনি মনে মনে বুঝিতেন যে, পরস্পরের এই ছলনা কেবল পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ্যবশতঃ।

কিন্তু আমার বিষম বিরক্তি বোধ হইত। অল্প বয়সে পরের নিরীহ গর্ব্বও দমন করিতে ইচ্ছা করে এবং সহস্র গুরুতর অপরাধের তুলনায় নির্ব্বুদ্ধিতাই সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য বোধ হয়। কৈলাস বাবু ঠিক নির্ব্বোধ ছিলেন না, কাজে কর্ম্মে তাঁহার সহায়তা এবং পরামর্শ সকলেই প্রার্থনীয় জ্ঞান করিত। কিন্তু নয়নজোড়ের গৌরব প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র কাণ্ড-জ্ঞান ছিল না! সকলে তাঁহাকে ভালবাসিয়া এবং আমোদ করিয়া তাঁহার কোন অসম্ভব কথাতেই প্রতিবাদ করিত না বলিয়া তিনি আপনার কথার পরিমাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। অন্য লোকেও যখন আমোদ করিয়া অথবা তাঁহাকে

সন্তুষ্ট করিবার জন্য নয়নজোড়ের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে বিপরীত মাত্রায় অত্যুক্তি প্রয়োগ করিত, তিনি অকাতরে সমস্ত গ্রহণ করিতেন এবং স্বপ্নেও সন্দেহ করিতেন না যে, অন্য কেহ এ সকল কথা লেশমাত্র অবিশ্বাস করিতে পারে।

আমার এক এক সময় ইচ্ছা করিত, বৃদ্ধ এই যে মিথ্যা দুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে এবং মনে করিতেছে ইহা চিরস্থায়ী, এই দুর্গটি দুই তোপে সর্ব্বসমক্ষে উড়াইয়া দিই। একটা পাখীকে সুবিধামত ডালের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিলেই শিকারীর ইচ্ছা করে তাহাকে গুলি বসাইয়া দিতে, পাহাড়ের গায়ে একটা প্রস্তর পতনোন্মুখ থাকিতে দেখিলেই বালকের ইচ্ছা করে এক লাথি মারিয়া তাহাকে গড়াইয়া ফেলিতে—যে জিনিবটা প্রতি মুহূর্ত্তে পড়ি পড়ি করিতেছে অথচ কোন একটা কিছুতে সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাকে ফেলিয়া দিলেই তবে যেন তাহার সম্পূর্ণতা সাধন এবং দর্শকের মনের তৃপ্তিলাভ হয়। কৈলাস বাবুর মিথ্যাগুলি এতই সরল, তাহার ভিত্তি এতই দুর্ব্বল, তাহা ঠিক সত্য বন্দুকের লক্ষ্যের সাম্‌নে এমনি বুক ফুলাইয়া নৃত্য করিত যে, তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনাশ করিবার জন্য একটি আবেগ উপস্থিত হইত—কেবল নিতান্ত আলস্যবশতঃ এবং সর্ব্বজনসম্মত প্রথার অনুসরণ করিয়া সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিজের অতীত মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া যতটা মনে পড়ে তাহাতে মনে হয়, কৈলাস বাবুর প্রতি আমার আন্তরিক বিদ্বেষের আর একটি গূঢ় কারণ ছিল। তাহা একটু বিবৃত করিয়া বলা আবশ্যক।

আমি বড়মানুষের ছেলে হইয়াও যথাকালে এম্, এ, পাস্ করিয়াছি, যৌবন সত্বেও কোন প্রকার কুসংসর্গ কুৎসিত আমোদে যোগ দিই নাই, এবং অভিভাবকের মৃত্যুর পরে স্বয়ং কর্ত্তা হইয়াও আমার স্বভাবের কোন প্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয় নাই। তাহা ছাড়া চেহারাটা এমন যে, তাহাকে আমি নিজ মুখে সুশ্রী বলিলে অহঙ্কার হইতে পারে কিন্তু মিথ্যাবাদ হয় না।

অতএব বাঙ্গলা দেশে ঘট্‌কালির হাটে আমার দাম যে অত্যন্ত বেশী তাহাতে আর সন্দেহ নাই—এই হাটে আমার সেই দাম আমি পুরা আদায় করিয়া লইব, এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ধনী পিতার পরম রূপবতী একমাত্র বিদূষী কন্যা আমার কল্পনায় আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছিল।

দশ হাজার বিশ হাজার টাকা পণের প্রস্তাব করিয়া দেশ বিদেশ হইতে আমার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। আমি অবিচলিতচিত্তে নিক্তি ধরিয়া তাহাদের যোগ্যতাযোগ্যতা ওজন করিয়া লইতেছিলাম, কোনটাই আমার সমযোগ্য বোধ হয়

নাই। অবশেষে ভবভূতির ন্যায় আমার ধারণা হইয়াছিল যে,—

কি জানি জন্মিতে পারে মম সমতুল,
অসীম সময় আছে, বসুধা বিপুল।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে এবং ক্ষুদ্র বঙ্গদেশে সেই অসম্ভব দুর্লভ পদার্থ জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।

কন্যাদায়গ্রস্তগণ প্রতিনিয়ত নানা ছন্দে আমার স্তবস্তুতি এবং বিবিধোপচারে আমার পূজা করিতে লাগিল। কন্যা পছন্দ হউক বা না হউক, এই পূজা আমার মন্দ লাগিল না। ভাল ছেলে বলিয়া, কন্যার পিতৃগণের এই পূজা আমার উচিতপ্রাপ্য স্থির করিয়াছিলাম। শাস্ত্রে পড়া যায়, দেবতা বর দিন্ আর না দিন্, যথাবিধি পূজা না পাইলে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। নিয়মিত পূজা পাইয়া আমারও মনে সেইরূপ অত্যুচ্চ দেবভাব জন্মিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, ঠাকুর্দ্দা মশায়ের একটি পৌত্রী ছিল। তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি কিন্তু কখনও রূপবতী বলিয়া ভ্রম হয় নাই। সুতরাং তাহাকে বিবাহ করিবার কল্পনাও আমার মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, কৈলাস বাবু, লোকমারফৎ অথবা স্বয়ং পৌত্রীটিকে অর্ঘ্য দিবার মানসে আমার পূজার বোধন করিতে আসিবেন, কারণ, আমি ভাল ছেলে। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না।

শুনিতে পাইলাম, আমার কোন বন্ধুকে তিনি বলিয়াছিলেন, নয়নজোড়ের বাবুরা কখনও কোন বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কাহারও নিকটে প্রার্থনা করে নাই—কন্তা যদি চির-কুমারী হইয়া থাকে তথাপি সে কুলপ্রথা তিনি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না।

শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল। সে রাগ অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে ছিল—কেবল ভাল ছেলে বলিয়াই চুপচাপ করিয়াছিলাম।

যেমন বজ্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ থাকে, তেমনি আমার চরিত্রে রাগের সঙ্গে সঙ্গে একটা কৌতুকপ্রিয়তা জড়িত ছিল। বৃদ্ধকে শুদ্ধমাত্র নিপীড়ন করা আমার দ্বারা সম্ভব হইত না—কিন্তু একদিন হঠাৎ এমন একটা কৌতুকাবহ প্ল্যান্ মাথায় উদয় হইল, যে, সেটা কাজে খাটাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত নানা লোকে নানা মিথ্যা কথার সৃজন করিত। পাড়ার একজন পেন্সন-ভোগী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রায় বলিতেন, ঠাকুর্দ্দা, ছোটলাটের সঙ্গে যখনি দেখা হয় তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের খবর না নিয়ে ছাড়েন না—সাহেব বলেন, বাঙ্গলাদেশে, বর্দ্ধমানের রাজা এবং নয়নজোড়ের বাবু, এই দুটি মাত্র যথার্থ বনেদী বংশ আছে।

ঠাকুর্দ্দা ভারি খুসি হইতেন—এবং ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি বাবুর

সহিত সাক্ষাৎ হইলে অন্যান্য কুশলসংবাদের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন—ছোটলাট সাহেব ভাল আছেন? তাঁর মেমসাহেব ভাল আছেন? তাঁর পুত্রকন্যারা সকলেই ভাল আছেন? সাহেবের সহিত শীঘ্র একদিন সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি নিশ্চয় জানিতেন, নয়নজোড়ের বিখ্যাত চৌধুড়ি প্রস্তুত হইয়া দ্বারে আসিতে আসিতে বিস্তর ছোট লাট এবং বড় লাট বদল হইয়া যাইবে!

আমি একদিন প্রাতঃকালে গিয়া কৈলাস বাবুকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিলাম—ঠাকুর্দ্দা, কাল লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের লেভিতে গিয়েছিলুম। তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের কথা পাড়াতে আমি বল্লুম নয়নজোড়ের কৈলাস বাবু কলকাতাতেই আছেন—শুনে ছোটলাট এতদিন দেখা কর্‌তে আসেন নি বলে ভারি দুঃখিত হলেন—বলে দিলেন আজই দুপুর বেলা তিনি গোপনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আস্‌বেন।

আর কেহ হইলে কথাটার অসম্ভবতা বুঝিতে পারিত এবং আর কাহারও সম্বন্ধে হইলে কৈলাস বাবুও এ কথায় হাস্য করিতেন—কিন্তু নিজের সম্বন্ধীয় বলিয়া এ সংবাদ তাঁহার লেশমাত্র অবিশ্বাস্য বোধ হইল না। শুনিয়া যেমন খুসি হইলেন তেমনি অস্থির হইয়া উঠিলেন—কোথায় বসাইতে হইবে, কি করিতে হইবে, কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন—কি

উপায়ে নয়নজোড়ের গৌরব রক্ষিত হইবে কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। তাহা ছাড়া, তিনি ইংরাজি জানেন না, কথা চালাইবেন কি করিয়া সেও এক সমস্যা।

আমি বলিলাম সে জন্য ভাবনা নাই, তাঁহার সঙ্গে এক জন করিয়া দোভাষী থাকে; কিন্তু ছোটলাট সাহেবের বিশেষ ইচ্ছা, আর কেহ যেন উপস্থিত না থাকে।

মধ্যাহ্নে পাড়ার অধিকাংশ লোক যখন আপিসে গিয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রামগ্ন তখন কৈলাস বাবুর বাসার সম্মুখে এক জুড়ি আসিয়া দাঁড়াইল।

তক্‌মা-পরা চাপ্‌রাসি তাঁহাকে খবর দিল ছোটলাট সাহেব আয়া! ঠাকুর্দ্দা প্রাচীনকাল-প্রচলিত শুভ্র জামাযোড়া এবং পাগ্‌ড়ি পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন তাঁহার পুরাতন ভৃত্য গণেশটিকেও তাঁহার নিজের ধুতি চাদর জামা পরাইয়া ঠিক-ঠাক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছোটলাটের আগমনসংবাদ শুনিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন—এবং সন্নতদেহে বারম্বার সেলাম করিতে করিতে ইংরাজবেশধারী আমার এক প্রিয়বয়স্যকে ঘরে লইয়া গেলেন।

সেখানে চৌকির উপরে তাঁহার একমাত্র বহুমূল্য শালটি পাতিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারই উপর কৃত্রিম ছোটলাটকে বসাইয়া উর্দ্দু ভাষায় এক অতি বিনীত সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিলেন, এবং নজরের স্বরূপে স্বর্ণ রেকাবীতে তাঁহাদের বহু-

কণ্ঠরক্ষিত কুলক্রমাগত এক আস্‌রফির মালা ধরিলেন। প্রাচীন ভৃত্য গণেশ গোলাপপাশ এবং আতরদান লইয়া উপস্থিত ছিল।

কৈলাস বাবু বারম্বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের নয়নজোড়ের বাড়িতে হুজুর বাহাদুরের পদধূলি পড়িলে তাঁহাদের যথাসাধ্য যথোচিত আতিথ্যের আয়োজন করিতে পারিতেন—কলিকাতায় তিনি প্রবাসী—এখানে তিনি জলহীন মীনের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়েই অক্ষম—ইত্যাদি।

আমার বন্ধু দীর্ঘ হ্যাট্‌ সমেত অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। ইংরাজ কায়দা-অনুসারে এরূপ স্থলে মাথায় টুপি না থাকিবার কথা কিন্তু আমার বন্ধু ধরা পড়িবার ভয়ে যথাসম্ভব আচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টায় টুপি খোলেন নাই। কৈলাসবাবু এবং তাঁহার গর্ব্বান্ধ প্রাচীন ভৃত্যটি ছাড়া আর সকলেই মুহূর্ত্তের মধ্যেই বাঙ্গালীর এই ছদ্মবেশ ধরিতে পারিত।

দশমিনিট কাল ঘাড় নাড়িয়া আমার বন্ধু গাত্রোত্থান করিলেন এবং পূর্ব্বশিক্ষামত চাপ্‌রাসিগণ সোনার রেকাবীশুদ্ধ আসরফির মালা, চৌকি হইতে সেই শাল, এবং ভৃত্যের হাত হইতে গোলাপপাশ এবং আতরদান সংগ্রহ করিয়া ছদ্মবেশীর গাড়িতে তুলিয়া দিল—কৈলাস বাবু বুঝিলেন ইহাই ছোটলাটের প্রথা। আমি গোপনে এক পাশের ঘরে লুকাইয়া দেখিতেছিলাম এবং রুদ্ধ হাস্যাবেগে আমার পঞ্জর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

অবশেষে কিছুতে আর থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া কিঞ্চিৎ-দূরবর্ত্তী এক ঘরের মধ্যে গিয়া প্রকাশ করিলাম—এবং সে-খানে হাসির উচ্ছ্বাস উন্মুক্ত করিয়া দিয়া হঠাৎ দেখি, একটি বালিকা তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

আমাকে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ তক্তা ছাড়িয়া দাঁড়াইল—এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রোষের গর্জ্জন আনিয়া আমার মুখের উপর সজল বিপুল কৃষ্ণচক্ষের সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া কহিল—"আমার দাদামশায় তোমাদের কি করেছেন—কেন তোমরা তাঁকে ঠকাতে এসেচ—কেন এসেচ তোমরা"—অবশেষে আর কোন কথা জুটিল না—বাক্‌রুদ্ধ হইয়া মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কোথায় গেল আমার হাস্যাবেগ! আমি যে কাজটি করি-য়াছি তাহার মধ্যে কৌতুক ছাড়া আর যে কিছু ছিল এতক্ষণ তাহা আমার মাথায় আসে নাই—হঠাৎ দেখিলাম অত্যন্ত কোমল স্থানে অত্যন্ত কঠিন আঘাত করিয়াছি; হঠাৎ আমার কৃত কার্য্যের বীভৎস নিষ্ঠুরতা আমার সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল—লজ্জায় এবং অনুতাপে পদাহত কুক্কুরের ন্যায় ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলাম। বৃদ্ধ আমার কাছে কি দোষ করিয়াছিল? তাহার নিরীহ অহঙ্কার ত কখন কোন প্রাণীকে আঘাত করে নাই। আমার অহঙ্কার কেন এমন হিংস্রমূর্ত্তি ধারণ করিল?

তাহা ছাড়া আর একটি বিষয়ে আজ হঠাৎ দৃষ্টি খুলিয়া গেল। এতদিন আমি কুসুমমণিকে, কোন অবিবাহিত পাত্রের প্রসন্ন দৃষ্টিপাতের প্রতীক্ষায় সংরক্ষিত পণ্য-পদার্থের মত দেখিতাম—ভাবিতাম, আমি পছন্দ করি নাই বলিয়া ও পড়িয়া আছে, দৈবাৎ যাহার পছন্দ হইবে ও তাহারই হইবে। আজ দেখিলাম এই গৃহকোণে, ঐ বালিকামূর্ত্তির অন্তরালে একটি মানব হৃদয় আছে। তাহার নিজের সুখ দুঃখ অনুরাগ বিরাগ লইয়া একটি অন্তঃকরণ একদিকে অজ্ঞেয় অতীত আর একদিকে অভাবনীয় ভবিষ্যৎ নামক দুই অনন্ত রহস্যরাজ্যের দিকে পূর্ব্বে পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। যে মানুষের মধ্যে হৃদয় আছে সে কি কেবল পণের টাকা এবং নাক চোখের পরিমাণ মাপিয়া পছন্দ করিয়া লইবার যোগ্য?

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রত্যূষে বৃদ্ধের সমস্ত অপহৃত বহুমূল্য দ্রব্যগুলি লইয়া চোরের ন্যায় চুপি চুপি ঠাকুর্দ্দার বাসায় গিয়া প্রবেশ করিলাম—ইচ্ছা ছিল কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে চাকরের হাতে সমস্ত দিয়া আসিব।

চাকরকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ করিতেছি এমন সময় অদূরবর্ত্তী ঘরে বৃদ্ধের সহিত বালিকার কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। বালিকা সুমিষ্ট সস্নেহ স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, দাদা মশায়, কাল লাট সাহেব তোমাকে কি বল্লেন? ঠাকুর্দ্দা অত্যন্ত হর্ষিত চিত্তে লাট সাহেবের মুখে প্রাচীন নয়নজোড় বংশের বিস্তর কাল্পনিক গুণানুবাদ বসা-

ইতেছিলেন। বালিকা তাহাই শুনিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতেছিল।

বৃদ্ধ অভিভাবকের প্রতি মাতৃহৃদয়া এই ক্ষুদ্র বালিকার সকরুণ ছলনায় আমার দুই চক্ষে জল ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিলাম—অবশেষে ঠাকুর্দ্দা তাঁহার কাহিনী সমাপন করিয়া চলিয়া আসিলে আমার প্রতারণার বমালগুলি লইয়া বালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং নিঃশব্দে তাহার সম্মুখে সমস্ত রাখিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

বর্ত্তমান কালের প্রথানুসারে অন্যদিন বৃদ্ধকে দেখিয়া কোন প্রকার অভিবাদন করিতাম না—আজ তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বৃদ্ধ নিশ্চয় মনে ভাবিলেন, গতকল্য ছোট লাট তাঁহার বাড়িতে আসাতেই সহসা তাঁহার প্রতি আমার ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। তিনি পুলকিত হইয়া শতমুখে ছোটলাটের গল্প বানাইয়া বলিতে লাগিলেন—আমিও কোন প্রতিবাদ না করিয়া তাহাতে যোগ দিলাম। বাহিরের অন্য লোক যাহারা শুনিল তাহারা এ কথাটাকে আদ্যোপান্ত গল্প বলিয়া স্থির করিল, এবং সকৌতুকে বৃদ্ধের সহিত সকল কথায় সায় দিয়া গেল।

সকলে উঠিয়া গেলে আমি অত্যন্ত সলজ্জ মুখে দীনভাবে বৃদ্ধের নিকট একটি প্রস্তাব করিলাম। বলিলাম, যদিও নয়নজোড়ের বাবুদের সহিত আমাদের বংশমর্য্যাদার তুলনাই হইতে পারে না তথাপি—

প্রস্তাবটা শেষ হইবামাত্র বৃদ্ধ আমাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, এবং আনন্দবেগে বলিয়া উঠিলেন—আমি গরীব—আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে তা আমি জানতুম না ভাই—আমার কুসুম অনেক পুণ্য করেছে তাই তুমি আজ ধরা দিলে! বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ, আজ এই প্রথম, তাঁহার মহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া স্বীকার করিলেন যে, তিনি গরীব, স্বীকার করিলেন যে, আমাকে লাভ করিয়া নয়নজোড় বংশের গৌরব হানি হয় নাই। আমি যখন বৃদ্ধকে অপদস্থ করিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছিলাম তখন বৃদ্ধ আমাকে পরম সৎপাত্র জানিয়া একান্তমনে কামনা করিতেছিলেন।

প্রতিহিংসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুকুন্দ বাবুদের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানের পৌত্রী, বর্ত্তমান ম্যানেজারের স্ত্রী ইন্দ্রাণী অশুভক্ষণে বাবুদের বাড়িতে তাঁহাদের দৌহিত্রের বিবাহে বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

তৎপূর্ব্বকার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া রাখিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে।

এক্ষণে মুকুন্দ বাবুও ভূতপূর্ব্ব, তাঁহার দেওয়ান গৌরীকান্তও ভূতপূর্ব্ব; কালের আহ্বান অনুসারে উভয়ের কেহই স্বস্থানে সশরীরে বর্ত্তমান নাই। কিন্তু যখন ছিলেন তখন উভয়ের মধ্যে বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। পিতৃমাতৃহীন গৌরীকান্তের যখন কোন জীবনোপায় ছিল না, তখন মুকুন্দলাল কেবলমাত্র মুখ দেখিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপরে নিজের ক্ষুদ্র বিষয় সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণের ভার দেন। কালে প্রমাণ হইল যে, মুকুন্দলাল ভুল করেন নাই। কীট যেমন করিয়া বল্মীক রচনা করে, স্বর্গকামী যেমন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করে, গৌরীকান্ত তেমনি করিয়া অশ্রান্ত যত্নে তিলে তিলে দিনে দিনে মুকুন্দলালের বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

অবশেষে যখন তিনি কৌশলে আশ্চর্য্য সুলভ মূল্যে তরফ বাঁকাগাড়ি ক্রয় করিয়া মুকুন্দলালের সম্পত্তিভুক্ত করিলেন, তখন হইতে মুকুন্দবাবুরা গণ্যমান্য জমিদার শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রভুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যেরও উন্নতি হইল;—অল্পে অল্পে তাঁহার কোঠাবাড়ি, জোতজমা, এবং পূজার্চ্চনা বিস্তার লাভ করিল। এবং যিনি এককালে সামান্য তহশীলদার শ্রেণীর ছিলেন, তিনিও সাধারণের নিকট দেওয়ানজি নামে পরিচিত হইলেন।

ইহাই ভূতপূর্ব্ব কালের ইতিহাস। বর্ত্তমান কালে মুকুন্দ বাবুর একটি পোষ্যপুত্র আছেন, তাঁহার নাম বিনোদবিহারী। এবং গৌরীকান্তের সুশিক্ষিত নাতজামাই অম্বিকাচরণ তাঁহাদের ম্যানেজারের কাজ করিয়া থাকেন। দেওয়ানজি তাঁহার পুত্র রমাকান্তকে বিশ্বাস করিতেন না—সেই জন্য বার্দ্ধক্যবশতঃ নিজে যখন কাজ ছাড়িয়া দিলেন, তখন পুত্রকে লঙ্ঘন করিয়া নাতজামাই অম্বিকাকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

কাজকর্ম্ম বেশ চলিতেছে; পূর্ব্বের আমলে যেমন ছিল এখনও সকলি প্রায় তেমনি আছে, কেবল একটা বিষয়ে একটু প্রভেদ ঘটিয়াছে; এখন প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক কেবল কাজকর্ম্মের সম্পর্ক—হৃদয়ের সম্পর্ক নহে। পূর্ব্বকালে টাকা শস্তা ছিল এবং হৃদয়টাও কিছু সুলভ ছিল, এখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে হৃদয়ের বাজে খরচটা একপ্রকার রহিত হইয়াছে;

নিতান্ত আত্মীয়ের ভাগেই টানাটানি পড়িয়াছে, তা বাহিরের লোকে পাইবে কোথা হইতে!

ইতিমধ্যে বাবুদের বাড়িতে দৌহিত্রের বিবাহে বৌভাতের নিমন্ত্রণে দেওয়ানজীর পৌত্রী ইন্দ্রাণী গিয়া উপস্থিত হইল।

সংসারটা কৌতূহলী অদৃষ্টপুরুষের রাসায়নিক পরীক্ষা-শালা। এখানে কতকগুলা বিচিত্র-চরিত্র মানুষ একত্র করিয়া তাহাদের সংযোগ বিয়োগে নিয়ত কত চিত্রবিচিত্র অভূতপূর্ব্ব ইতিহাস সৃজিত হইতেছে, তাহার আর সংখ্যা নাই।

এই বৌভাতের নিমন্ত্রণস্থলে, এই আনন্দকার্য্যের মধ্যে দুটি দুই রকমের মানুষের দেখা হইল এবং দেখিতে দেখিতে সংসারের অশ্রান্ত জালবুনানীর মধ্যে একটা নূতন বর্ণের সূত্র উঠিয়া পড়িল এবং একটা নূতন রকমের গ্রন্থি পড়িয়া গেল।

সকলের আহারাদি শেষ হইয়া গেলে ইন্দ্রাণী বৈকালের দিকে কিছু বিলম্বে মনিববাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিনোদের স্ত্রী নয়নতারা যখন বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দ্রাণী গৃহকর্ম্মের ব্যস্ততা, শারীরিক অস্বাস্থ্য প্রভৃতি দুই চারিটা কারণ প্রদর্শন করিল, কিন্তু তাহা কাহারও সন্তোষ-জনক বোধ হইল না।

প্রকৃত কারণ যদিও ইন্দ্রাণী গোপন করিল তথাপি তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। সে কারণটি এই,—মুকুন্দ বাবুরা প্রভু ধনী বটেন কিন্তু কুলমর্য্যাদায় গৌরীকান্ত তাঁহা-দের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রাণী সে শ্রেষ্ঠতা ভুলিতে পারে

না। সেই জন্য মনিবের বাড়ি পাছে খাইতে হয় এই ভয়ে সে যথেষ্ট বিলম্ব করিয়া গিয়াছিল। তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তাহাকে খাওয়াইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল কিন্তু ইন্দ্রাণী পরাস্ত হইবার মেয়ে নহে, তাহাকে কিছুতেই খাওয়ান গেল না।

একবার মুকুন্দ এবং গৌরীকান্ত বর্ত্তমানেও কুলাভিমান লইয়া ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর বিপ্লব বাধিয়াছিল। সে ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইন্দ্রাণীকে দেখিতে বড় সুন্দর। আমাদের ভাষায় সুন্দরীর সহিত স্থির-সৌদামিনীর তুলনা প্রসিদ্ধ আছে। সে তুলনা অধিকাংশ স্থলেই খাটে না, কিন্তু ইন্দ্রাণীকে খাটে। ইন্দ্রাণী যেন আপনার মধ্যে একটা প্রবল বেগ এবং প্রখর জ্বালা একটি সহজ শক্তির দ্বারা অটল গাম্ভীর্য্যপাশে অতি অনায়াসে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যুৎ তাহার মুখে চক্ষে এবং সর্ব্বাঙ্গে নিত্যকাল ধরিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এখানে তাহার চপলতা নিষিদ্ধ।

এই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়া মুকুন্দ বাবু তাঁহার পোষ্য-পুত্রের সহিত ইহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব গৌরীকান্তের নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রভুভক্তিতে গৌরীকান্ত কাহারও নিকটে ন্যূন ছিলেন না; তিনি প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে পারিতেন; এবং তাঁহার অবস্থার যতই উন্নতি হউক এবং কর্ত্তা তাঁহার প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে

যতই প্রশ্রয় দিন তিনি কখনও ভ্রমেও স্বপ্নেও প্রভুর সম্মান বিস্মৃত হন নাই; প্রভুর সম্মুখে, এমন কি, প্রভুর প্রসঙ্গে তিনি যেন সন্নত হইয়া পড়িতেন—কিন্তু এই বিবাহের প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। প্রভুভক্তির দেনা তিনি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিতেন, কুলমর্য্যাদার পাওনা তিনি ছাড়িবেন কেন! মুকুন্দলালের পুত্রের সহিত তিনি তাঁহার পৌত্রীর বিবাহ দিতে পারেন না।

ভৃত্যের এই কুলগর্ব্ব মুকুন্দলালের ভাল লাগে নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দ্বারা তাঁহার ভক্ত সেবকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইবে; গৌরীকান্ত যখন কথাটা সে ভাবে লইলেন না তখন মুকুন্দলাল কিছুদিন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত মনঃকষ্ট দিয়াছিলেন। প্রভুর এই বিমুখভাব গৌরীকান্তের বক্ষে মৃত্যুশেলের ন্যায় বাজিয়াছিল কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার পৌত্রীর সহিত এক পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র কুলীনসন্তানের বিবাহ দিয়া তাহাকে ঘরে পালন করিয়া নিজের অর্থে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন।

সেই কুলমদগর্ব্বিত পিতামহের পৌত্রী ইন্দ্রাণী তাহার প্রভুগৃহে গিয়া আহার করিল না; ইহাতে তাহার প্রভুপত্নী নয়নতারার অন্তঃকরণে সুমধুর প্রীতিরস উদ্বেলিত হইয়া উঠে নাই সে কথা বলা বাহুল্য। তখন ইন্দ্রাণীর অনেকগুলি স্পর্দ্ধা নয়নতারার বিদ্বেষকষায়িত কল্পনাচক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

প্রথম, ইন্দ্রাণী অনেক গহনা পরিয়া অত্যন্ত সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। মনিববাড়িতে এত ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর করিয়া প্রভুদের সহিত সমকক্ষতা দেখাইবার কি আবশ্যক ছিল?

দ্বিতীয়, ইন্দ্রাণীর রূপের গর্ব্ব। ইন্দ্রাণীর রূপটা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং নিম্নপদস্থ ব্যক্তির এত অধিক রূপ থাকা অনাবশ্যক এবং অন্যায় হইতে পারে কিন্তু তাহার গর্ব্বটা সম্পূর্ণ নয়নতারার কল্পনা। রূপের জন্য কাহাকেও দোষী করা যায় না এই জন্য নিন্দা করিতে হইলে অগত্যা গর্ব্বের অবতারণা করিতে হয়।

তৃতীয়, ইন্দ্রাণীর দাম্ভিকতা,—চলিত ভাষায় যাহাকে বলে দেমাক্। ইন্দ্রাণীর একটি স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ছিল—অত্যন্ত প্রিয় পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত সে কাহারও সহিত মাথামাখি করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া গায়ে পড়িয়া একটা সোর্-গোল করা, অগ্রসর হইয়া সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া সেও তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল না।

এইরূপ নানাপ্রকার অমূলক ও সমূলক কারণে নয়নতারা ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং অনাবশ্যক সূত্র ধরিয়া ইন্দ্রাণীকে "আমাদের ম্যানেজারের স্ত্রী" "আমাদের দেওয়ানের নাত্নী" বলিয়া বারম্বার পরিচিত ও অভিহিত করিতে লাগিল। তাহার একজন প্রিয় মুখরা দাসীকে শিখাইয়া দিল—সে ইন্দ্রাণীর গায়ের উপর পড়িয়া পরম সখীভাবে তাহার গহনাগুলি হাত দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া সমালোচনা

করিতে লাগিল;—কণ্ঠী এবং বাজুবন্দের প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই, এ কি গিল্টিকরা?"

ইন্দ্রাণী পরম গম্ভীর মুখে কহিল, "না, এ পিতলের!"

নয়নতারা ইন্দ্রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ওগো, তুমি ওখানে একলা দাঁড়িয়ে কি কর্‌চ, এই খাবারগুলো হাট-খোলার পাল্কীতে তুলে দিয়ে এস না।" অদূরে বাড়ির দাসী উপস্থিত ছিল।

ইন্দ্রাণী কেবল মুহূর্ত্তকালের জন্য তাহার বিপুলপক্ষ্মছায়া-গভীর উদার দৃষ্টি মেলিয়া নয়নতারার মুখের দিকে চাহিল এবং পরক্ষণেই নীরবে মিষ্টান্নপূর্ণ সরা খুরি তুলিয়া লইয়া হাট-খোলার পাল্কীর উদ্দেশে নীচে চলিল।

যিনি এই মিষ্টান্ন উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কেন ভাই কষ্ট কর্‌চ, দাও না ঐ দাসীর হাতে দাও!"

ইন্দ্রাণী তাহাতে সম্মত না হইয়া কহিলেন, "এতে আর কষ্ট কিসের!"

অপরা কহিলেন, "তবে ভাই আমার হাতে দাও!"

ইন্দ্রাণী কহিলেন, "না, আমিই নিয়ে যাচ্চি।"

বলিয়া, অন্নপূর্ণা যেমন স্নিগ্ধগম্ভীর মুখে সমুচ্চ স্নেহে ভক্তকে স্বহস্তে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন, তেমনি অটল-স্নিগ্ধভাবে তিনি পাল্কীতে মিষ্টান্ন রাখিয়া আসিলেন—এবং সেই দুই মিনিটকালের সংস্রবে হাটখোলাবাসিনী ধনিগৃহ-বধূ

এই স্বল্পভাষিণী মিতহাসিনী ইন্দ্রাণীর সহিত জন্মের মত প্রাণের সখীত্ব স্থাপনের জন্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

এইরূপে নয়নতারা স্ত্রীজনসুলভ নিষ্ঠুর নৈপুণ্যের সহিত যতগুলি অপমানশর বর্ষণ করিল ইন্দ্রাণী তাহার কোনটাকেই গায়ে বিঁধিতে দিল না;—সকলগুলিই তাহার অকলঙ্ক সমুজ্জ্বল সহজ তেজস্বিতার কঠিন বর্ম্মে ঠেকিয়া আপনি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। তাহার গম্ভীর অবিচলতা দেখিয়া নয়নতারার আক্রোশ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং ইন্দ্রাণী তাহা বুঝিতে পারিয়া এক সময় অলক্ষ্যে কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া বাড়ি চলিয়া আসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যাহারা শান্তভাবে সহ্য করে তাহারা গভীরতররূপে আহত হয়; অপমানের আঘাত ইন্দ্রাণী যদিও অসীম অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তথাপি তাহা তাহার অন্তরে বাজিয়াছিল।

ইন্দ্রাণীর সহিত যেমন বিনোদবিহারীর বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল তেমনি এক সময় ইন্দ্রাণীর এক দূর সম্পর্কের নিঃস্ব পিস্তুতো ভাই বামাচরণের সহিত নয়নতারার বিবাহের কথা হয়;—সেই বামাচরণ এখন বিনোদের সেরেস্তায় একজন

সামান্য কর্ম্মচারী। ইন্দ্রাণীর এখনো মনে পড়ে, বাল্যকালে একদিন নয়নতারার বাপ নয়নকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাড়িতে আসিয়া বামাচরণের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য গৌরীকান্তকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে ক্ষুদ্র বালিকা নয়নতারার অসামান্য প্রগল্‌ভতায় গৌরীকান্তের অন্তঃপুরে সকলেই আশ্চর্য্য এবং কৌতুকান্বিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার সেই অকালপক্কতার নিকট মুখ-চোরা লাজুক ইন্দ্রাণী নিজেকে নিতান্ত অক্ষমা অনভিজ্ঞা জ্ঞান করিয়াছিল। গৌরীকান্ত এই মেয়েটির অনর্গল কথায় বার্ত্তায় এবং চেহারায় বড়ই খুসী হইয়াছিলেন কিন্তু কুলের যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকায় বামাচরণের সহিত ইহার বিবাহপ্রস্তাবে মত দিলেন না। অবশেষে তাঁহারই পছন্দে এবং তাঁহারই চেষ্টায় অকুলীন বিনোদের সহিত নয়নতারার বিবাহ হয়।

এই সকল কথা মনে করিয়া ইন্দ্রাণী কোন সান্ত্বনা পাইল না, বরং অপমান আরও বেশী করিয়া বাজিতে লাগিল। মহা-ভারতে বর্ণিত শুক্রাচার্য্যদুহিতা দেবযানী এবং শর্ম্মিষ্ঠার কথা মনে পড়িল। দেবযানী যেমন তাহার প্রভুকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার দর্প-চূর্ণ করিয়া তাহাকে দাসী করিয়াছিল, ইন্দ্রাণী যদি তেমনি করিতে পারিত তবেই যথোপযুক্ত বিধান হইত। এক সময় ছিল, যখন দৈত্যদের নিকট দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের ন্যায় মুকুন্দ বাবুর পরিবারবর্গের নিকট তাহার পিতামহ গৌরীকান্ত একান্ত আবশ্যক ছিলেন। তখন তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন

তবে মুকুন্দ বাবুকে হীনতা স্বীকার করাইতে পারিতেন—কিন্তু তিনিই মুকুন্দলালের বিষয় সম্পত্তিকে উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অতএব আজ আর তাঁহাকে স্মরণ করিয়া প্রভুদের কৃতজ্ঞ হইবার আবশ্যকতা নাই। ইন্দ্রাণী মনে করিল, বাঁকাগাড়ি পরগণা তাহার পিতামহ অনায়াসে নিজের জন্যই কিনিতে পারিতেন, তখন তাঁহার সে ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, তাহা না করিয়া তিনি সেটা মনিবকে কিনিয়া দিলেন—ইহা যে এক-প্রকার দান করা সে কথা কি আজ সেই মনিবের বংশে কেহ মনে করিয়া রাখিয়াছে? আমাদেরই দত্ত ধনমানের গর্ব্বে তোমরা আমাদিগকে আজ অপমান করিবার অধিকার পাই-য়াছ ইহাই মনে করিয়া ইন্দ্রাণীর চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল তাহার স্বামী প্রভুগৃহের নিমন্ত্রণ ও তাহার পরে জমিদারী কাছারির সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া তাঁহার শয়নকক্ষের একটি কেদারা আশ্রয় করিয়া নিভৃত খবরের কাগজ পাঠ করিতেছেন।

অনেকের ধারণা আছে যে স্বামী স্ত্রীর স্বভাব প্রায়ই এক-রূপ হইয়া থাকে। তাহার কারণ, দৈবাৎ কোন কোন স্থলে স্বামীস্ত্রীর স্বভাবের মিল দেখিতে পাইলে সেটা আমাদের নিকট এমন সমুচিত এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে, আমরা আশা করি এই নিয়ম বুঝি অধিকাংশ স্থলেই খাটে। যাহা হউক, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অম্বিকাচরণের সহিত ইন্দ্রাণীর দুই

একটা বিশেষ বিষয়ে বাস্তবিক স্বভাবের মিল দেখা যায়। অম্বিকাচরণ তেমন মিশুক্ লোক নহেন। তিনি বাহিরে যান কেবলমাত্র কাজ করিতে। নিজের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করিয়া এবং অন্যকে পূরামাত্রায় কাজ করাইয়া লইয়া বাড়ি আসিয়া যেন তিনি অনাত্মীয়তার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক দুর্গম দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেন। বাহিরে তিনি এবং তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ঘরের মধ্যে তিনি এবং তাঁহার ইন্দ্রাণী—ইহাতেই তাঁহার সমস্ত জীবন পর্য্যাপ্ত।

ভূষণের ছটা বিস্তার করিয়া যখন সুসজ্জিতা ইন্দ্রাণী ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন অম্বিকাচরণ তাঁহাকে পরিহাস করিয়া কি একটা কথা বলিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু সহসা ক্ষান্ত হইয়া চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি হয়েচে ?"

ইন্দ্রাণী তাঁহার সমস্ত চিন্তা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "কি আর হবে ? সম্প্রতি আমার স্বামী রত্নের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে।"

অম্বিকা খবরের কাগজ ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন —"সে ত আমার অগোচর নেই। তৎপূর্ব্বে ?"

ইন্দ্রাণী একে একে গহনা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "তৎপূর্ব্বে স্বামিনীর কাছ থেকে সমাদর লাভ হয়েচে।"

অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন—"সমাদরটা কি রকমের ?"

ইন্দ্রাণী স্বামীর কাছে আসিয়া তাঁহার কেদারার হাতার

উপর বসিয়া তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া উত্তর করিল, "তোমার কাছ থেকে যে রকমের পাই ঠিক সে রকমের নয়।"

তাহার পর, ইন্দ্রাণী একে একে সকল কথা বলিয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল স্বামীর কাছে এ সকল অপ্রিয় কথার উত্থাপন করিবে না; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না, এবং ইহার অনুরূপ প্রতিজ্ঞাও ইন্দ্রাণী ইতিপূর্ব্বে কখনও রক্ষা করিতে পারে নাই। বাহিরের লোকের নিকট ইন্দ্রাণী যতই সংযত সমাহিত হইয়া থাকিত, স্বামীর নিকটে সে সেই পরিমাণে আপন প্রকৃতির সমুদয় স্বাভাবিক বন্ধনমোচন করিয়া ফেলিত—সেখানে লেশমাত্র আত্মগোপন করিতে পারিত না।

অম্বিকাচরণ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, এখনি আমি কাজে ইস্তফা দিব। তৎক্ষণাৎ তিনি বিনোদ বাবুকে এক কড়া চিঠি লিখিতে উদ্যত হইলেন।

ইন্দ্রাণী তখন চৌকির হাতা হইতে নীচে নামিয়া মাদুরপাতা মেঝের উপর স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার কোলের উপর বাহু রাখিয়া বলিল—এত তাড়াতাড়ি কাজ নেই। চিঠি আজ থাক্। কাল সকালে যা হয় স্থির কোরো।

অম্বিকা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, না, আর এক দণ্ড বিলম্ব করা উচিত নয়।

ইন্দ্রাণী তাহার পিতামহের হৃদয়মৃণালে একটিমাত্র পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অন্তর হইতে সে যেমন স্নেহ-

রস আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল তেমনি পিতামহের চিত্তসঞ্চিত অনেকগুলি ভাব সে অলক্ষ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। মুকুন্দ-লালের পরিবারের প্রতি গৌরীকান্তের যে একটি অচল নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল ইন্দ্রাণী যদিও তাহা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু প্রভুপরিবারের হিতসাধনে জীবন অর্পণ করা যে তাহাদের কর্ত্তব্য, এই ভাবটি তাহার মনে দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাহার সুশিক্ষিত স্বামী ইচ্ছা করিলে ওকালতী করিতে পারি-তেন, সম্মানজনক কাজ লইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর হৃদয়ের দৃঢ় সংস্কার অনুসরণ করিয়া তিনি অনন্যমনে সন্তুষ্ট-চিত্তে বিনোদের বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ইন্দ্রাণী যদিও অপমানে আহত হইয়াছিল, তথাপি তাহার স্বামী যে বিনোদলালের কাজ ছাড়িয়া দিবে এ তাহার কিছু-তেই মনে লইল না।

ইন্দ্রাণী তখন যুক্তির অবতারণা করিয়া মৃদু মিষ্ট স্বরে কহিল—বিনোদ বাবুর ত কোন দোষ নেই তিনি এর কিছুই জানেন না—তাঁর স্ত্রীর উপর রাগ করে তুমি হঠাৎ তাড়া-তাড়ি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবে কেন ?

শুনিয়া অম্বিকা বাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন—নিজের সংকল্প তাঁহার নিকট অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। তিনি কহিলেন, "সে একটা কথা বটে! কিন্তু মনিব হোন্ আর যিনিই হোন্ ওদের ওখানে আর কখন তোমাকে পাঠাচ্ছিনে।"

এই অল্প একটু ঝড়েই সে দিনকার মত মেঘ কাটিয়া গেল, গৃহ প্রসন্ন হইয়া উঠিল এবং স্বামীর বিশেষ আদরে ইন্দ্রাণী বাহিরের সমস্ত অনাদর বিস্মৃত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিনোদবিহারী অম্বিকাচরণের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া জমিদারীর কাজ কিছুই দেখিতেন না। নিতান্ত-নির্ভর ও অতিনিশ্চয়তাবশতঃ কোন কোন স্বামী ঘরের স্ত্রীকে যেরূপ অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকে, নিজের জমিদারীর প্রতিও বিনোদের কতকটা সেই ভাবের উপেক্ষা ছিল। জমিদারীর আয় এতই নিশ্চিত এতই বাঁধা যে তাহাকে আয় বলিয়া বোধ হয় না—তাহা অভ্যস্ত, এবং তাহার কোন আকর্ষণ ছিল না।

বিনোদের ইচ্ছা ছিল, একটা সংক্ষেপ সুড়ঙ্গপথ অবলম্বন করিয়া হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে কুবেরের ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেই জন্য নানা লোকের পরামর্শে তিনি গোপনে নানা প্রকার আজগুবী ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেন। কখনও স্থির হইত দেশের সমস্ত বাব্‌লা গাছ জমা লইয়া গোরুর গাড়ির চাকা তৈরি করিবেন, কখনও পরামর্শ হইত সুন্দর বনের সমস্ত মধুচক্র তিনি আহরণ করিবেন, কখনও লোক

পাঠাইয়া পশ্চিম প্রদেশের বনগুলি বন্দোবস্ত করিয়া হরীতকীর ব্যবসায় একচেটে করিবার আয়োজন হইত। বিনোদ মনে মনে ইহা বুঝিতেন যে, অন্ত লোকে শুনিলে হাসিবে, সেই জন্ত কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। বিশেষতঃ অম্বিকাচরণকে তিনি একটু বিশেষ লজ্জা করিতেন ; অম্বিকা পাছে মনে করেন তিনি টাকাগুলো নষ্ট করিতে বসিয়াছেন সেজন্ত মনে মনে সঙ্কুচিত ছিলেন। অম্বিকার নিকট তিনি এমনভাবে থাকিতেন যেন অম্বিকাই জমিদার এবং তিনি কেবল বসিয়া থাকিবার জন্ত বার্ষিক কত টাকা করিয়া বেতন পাইতেন।

নিমন্ত্রণের পরদিন হইতে নয়নতারা তাঁহার স্বামীর কানে মন্ত্র দিতে লাগিলেন। তুমি ত নিজে কিছুই দেখ না, তোমাকে অম্বিকা হাত তুলিয়া যাহা দেয় তাহাই তুমি শিরোধার্য্য করিয়া লও ; এদিকে ভিতরে ভিতরে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা কেহই জানে না। তোমার ম্যানেজারের স্ত্রী যা গয়না পরিয়া আসিয়াছিল, এমন গয়না তোমার ঘরে আসিয়া আমি কখনো চক্ষেও দেখি নাই। এ সব গয়না সে পায় কোথা হইতে এবং এত দেমাকই বা তাহার বাড়িল কিসের জোরে! ইত্যাদি ইত্যাদি। গহনার বর্ণনা নয়নতারা অনেকটা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিল, এবং ইন্দ্রাণী নিজ মুখে তাহার দাসীকে কি সকল কথা বলিয়া গেছে তাহাও সে বহুল পরিমাণে রচনা করিয়া গেল।

বিনোদ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক—এক দিকে সে পরের প্রতি নির্ভর না করিয়াও থাকিতে পারে না, অপরদিকে যে তাহার কানে যেরূপ সন্দেহ তুলিয়া দেয় সে তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসে। ম্যানেজার যে চুরি করিতেছে মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। বিশেষতঃ কাজ সে নিজে দেখে না বলিয়া কল্পনায় সে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিল—অথচ কেমন করিয়া ম্যানেজারের চুরি ধরিতে হইবে তাহারও রাস্তা সে জানে না। স্পষ্ট করিয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারে এমন সাহস নাই—মহা মুস্কিল হইল।

অম্বিকাচরণের একাধিপত্যে কর্ম্মচারিগণ সকলেই ঈর্ষ্যান্বিত ছিল। বিশেষতঃ গৌরীকান্ত তাঁহার যে দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় বামাচরণকে কাজ দিয়াছিলেন, অম্বিকার প্রতি বিদ্বেষ তাহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কারণ, সম্পর্ক প্রভৃতি অনুসারে সে নিজেকে অম্বিকার সমান জ্ঞান করিত এবং অম্বিকা তাহার আত্মীয় হইয়াও কেবলমাত্র ঈর্ষ্যাবশতঃই তাহাকে উচ্চপদ দিতেছে না, এ ধারণা তার দৃঢ় ছিল। পদ পাইলেই পদের উপযুক্ত যোগ্যতা আপনি যোগায় এই তাহার মত। বিশেষতঃ ম্যানেজারের কাজকে সে অত্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিত; বলিত, সেকালে রথের উপর যেমন ধ্বজা থাকিত, আজকাল আপিসের কাজে ম্যানেজার সেইরূপ—ঘোড়াবেটা খাটিয়া মরে আর ধ্বজা মহাশয় রথের সঙ্গে সঙ্গে কেবল দর্পভরে দুলিতে থাকেন।

বিনোদ ইতিপূর্ব্বে কাজকর্ম্মের কোন খোঁজখবর লইত না—কেবল যখন ব্যবসা উপলক্ষে হঠাৎ অনেক টাকার আবশ্যক হইত তখন গোপনে খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত, এখন তহবিলে কত টাকা আছে? খাজাঞ্চি টাকার পরিমাণ বলিলে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সে টাকাটা চাহিয়া ফেলিত —যেন তাহা পরের টাকা। খাজাঞ্চি তাহার নিকট সই লইয়া টাকা দিত। তাহার পরে কিছু কাল ধরিয়া অম্বিকা বাবুর নিকট বিনোদ কুণ্ঠিত হইয়া থাকিত। কোন মতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলেই আরাম বোধ করিত।

অম্বিকাচরণ মাঝে মাঝে ইহা লইয়া বিপদে পড়িতেন। কারণ, জমিদারের অংশ জমিদারকে দিয়া তহবিলে প্রায় আমানতী, সদরখাজনা, অথবা আমলাবর্গের বেতন প্রভৃতি খরচের টাকা জমা থাকিত। সে টাকা অন্যায় ব্যয় হইয়া গেলে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু বিনোদ টাকাটি লইয়া এমনি চোরের মত লুকাইয়া বেড়াইত, যে, তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অবসর পাওয়া যাইত না—পত্র লিখিলেও কোন ফল হইত না—কারণ, লোকটার কেবল চক্ষুলজ্জা ছিল আর কোন লজ্জা ছিল না, এই জন্য সে কেবল সাক্ষাৎকারকে ডরাইত

ক্রমে যখন বিনোদ বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল তখন অম্বিকাচরণ বিরক্ত হইয়া লোহার সিন্ধুকের চাবি নিজের কাছে রাখিলেন। বিনোদের গোপনে টাকা লওয়া একেবারে বন্ধ

হইল। অথচ লোকটা এতই দুর্ব্বলপ্রকৃতি যে, প্রভু হইয়াও স্পষ্ট করিয়া এ সম্বন্ধে কোন প্রকার বল খাটাইতে পারিল না। অম্বিকাচরণের বৃথা চেষ্টা! অলক্ষ্মী যাহার সহায়, লোহার সিন্ধুকের চাবি তাহার টাকা আটক করিয়া রাখিতে পারে না। বরং হিতে বিপরীত হইল। কিন্তু সে সকল কথা পরে হইবে।

অম্বিকাচরণের কড়া নিয়মে বিনোদ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়াছিল। এমন সময় নয়নতারা যখন তাহার মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিল তখন সে কিছু খুসি হইল। গোপনে একে একে নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া সন্ধান লইতে লাগিল। তখন বামাচরণ তাহার প্রধান চর হইয়া উঠিল।

গৌরীকান্তের আমলে দেওয়ানজি বলপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের জমিতে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এমন করিয়া তিনি অনেকের অনেক জমি অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু অম্বিকাচরণ কখনও সে কাজে প্রবৃত্ত হইতেন না। এবং মকদ্দমা বাধিবার উপক্রম হইলে তিনি যথাসাধ্য আপষের চেষ্টা করিতেন। বামাচরণ ইহারই প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল, অম্বিকাচরণ নিশ্চয় অপরপক্ষ হইতে ঘুষ লইয়া মনিবের ক্ষতি করিয়া আপষ করিয়াছে। বামাচরণের নিজেরও বিশ্বাস তাহাই—যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে যে ঘুষ না লইয়া থাকিতে পারে ইহা সে মরিয়া গেলেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

এইরূপে গোপনে নানা মুখ হইতে ফুৎকার পাইয়া বিনোদের সন্দেহশিখা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—কিন্তু সে প্রত্যক্ষভাবে কোন উপায় অবলম্বন করিতেই সাহস করিল না। এক চক্ষুলজ্জা, দ্বিতীয়তঃ আশঙ্কা, পাছে সমস্ত অবস্থাভিজ্ঞ অম্বিকাচরণ তাহার কোন অনিষ্ট করে।

অবশেষে নয়নতারা স্বামীর এই কাপুরুষতায় জ্বলিয়া পুড়িয়া বিনোদের অজ্ঞাতসারে একদিন অম্বিকাচরণকে ডাকিয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে বলিলেন—"তোমাকে আর রাখা হবে না, তুমি রামাচরণকে সমস্ত হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাও!"

তাঁহার সম্বন্ধে বিনোদের নিকট আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে সে কথা অম্বিকা পূর্ব্বেই আভাসে জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্য নয়নতারার কথায় তিনি তেমন আশ্চর্য্য হন নাই; তৎক্ষণাৎ বিনোদবিহারীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি আপনি কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিতে চান?"

বিনোদ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "না কখনই না।"

অম্বিকাচরণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার উপর কি আপনার কোন সন্দেহের কারণ ঘটেছে?"

বিনোদ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল—"কিছুমাত্র না!" অম্বিকাচরণ নয়নতারার ঘটনা উল্লেখমাত্র না করিয়া আপিসে চলিয়া আসিলেন—বাড়িতে ইন্দ্রাণীকেও কিছু বলিলেন না। এইভাবে কিছুদিন গেল।

এমন সময় অম্বিকাচরণ ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়িলেন। শক্ত

ব্যামো নহে, কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ অনেকদিন আপিস কামাই করিতে হইল।

সেই সময় সদর খাজনা দেয় এবং অন্যান্য কাজের বড় ভীড়। সেই জন্য একদিন সকালে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া অম্বিকাচরণ হঠাৎ আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সে দিন কেহই তাঁহাকে প্রত্যাশা করে নাই, এবং সকলেই বলিতে লাগিল, আপনি বাড়ি যান, এত কাহিল শরীরে কাজ করিবেন না।

অম্বিকাচরণ নিজের দুর্ব্বলতার প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিয়া, ডেস্কে গিয়া বসিলেন। আম্‌লারা সকলেই কিছু যেন অস্থির হইয়া উঠিল এবং হঠাৎ অত্যন্ত অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত নিজ নিজ কাজে প্রবৃত্ত হইল।

অম্বিকা ডেস্ক্ খুলিয়া দেখেন তাহার মধ্যে তাঁহার একখানি কাগজও নাই। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কি; সকলেই যেন আকাশ হইতে পড়িল, চোরে লইয়াছে, কি, ভূতে লইয়াছে কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

বামাচরণ কহিল, "আরে মশায় আপনারা ন্যাকামি রেখে দিন্! সকলেই জানেন্, ওর কাগজপত্র বাবু নিজে তলব করে নিয়ে গেছেন।"

অম্বিকা রুদ্ধ-রোষে শ্বেতবর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন?'

বামাচরণ কাগজ লিখিতে লিখিতে বলিল, "সে আমরা কেমন করে বল্‌ব?"

বিনোদ অম্বিকাচরণের অনুপস্থিতি সুযোগে বামাচরণের মন্ত্রণাক্রমে নূতন চাবি তৈয়ার করাইয়া ম্যানেজারের প্রাই-ভেট্ ডেস্ক খুলিয়া তাঁহার সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে লইয়া গিয়াছেন। চতুর বামাচরণ সে কথা গোপন করিল না—অম্বিকা অপমানিত হইয়া কাজে ইস্তফা দেন ইহা তাহার অনভিপ্রেত ছিল না।

অম্বিকাচরণ ডেস্কে চাবি লাগাইয়া কাম্পিতদেহে বিনোদের সন্ধানে গেলেন—বিনোদ বলিয়া পাঠাইল তাহার মাথা ধরিয়াছে; সেথান হইতে বাড়ি গিয়া হঠাৎ দুর্ব্বলদেহে বিছা-নায় শুইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া যেন আবৃত করিয়া ধরিল। ক্রমে ইন্দ্রাণী সকল কথা শুনিল।

স্থির-সৌদামিনী আর স্থির রহিল না—তাহার বক্ষ ফুলিতে লাগিল, বিস্ফারিত মেঘকৃষ্ণ চক্ষুপ্রান্ত হইতে উন্মুক্ত বজ্রশিখা সুতীব্র শুভ্রজ্বালা বিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন স্বামীর এমন অপমান! এত বিশ্বাসের এই পুরস্কার!

ইন্দ্রাণীর এই অত্যুগ্র নিঃশব্দ রোষদাহ দেখিয়া অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল—তিনি যেন দেবতার শাসন হইতে পাপীকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রাণীর হাত ধরিয়া বলিলেন—"বিনোদ ছেলেমানুষ, দুর্ব্বলস্বভাব, পাঁচ জনের কথা শুনে তার মন বিগ্‌ড়ে গেছে!"

তখন ইন্দ্রাণী দুই হস্তে তাহার স্বামীর গলদেশ বেষ্টন

করিয়া তাঁহাকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত চাপিয়া ধরিল এবং হঠাৎ তাহার দুই চক্ষুর রোষদীপ্তি ম্লান করিয়া দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় হইতে সমস্ত অপমান হইতে দুই বাহু-পাশে টানিয়া লইয়া সে যেন তাহার হৃদয়দেবতাকে আপন হৃদয়মন্দিরে তুলিয়া রাখিতে চায়!

স্থির হইল অম্বিকাচরণ এখনি কাজ ছাড়িয়া দিবেন,—আজ আর কেহ তাহাতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু এই তুচ্ছ প্রতিশোধে ইন্দ্রাণীর মন কিছুই সান্ত্বনা মানিল না। যখন সন্দিগ্ধ প্রভু নিজেই অম্বিকাকে ছাড়াইতে উদ্যত, তখন কাজ ছাড়িয়া দিয়া তাহার আর কি শাসন হইল? কাজে জবাব দিবার সঙ্কল্প করিয়াই অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল, কিন্তু সকল কাজকর্ম্ম সকল আরাম বিশ্রামের মধ্যে ইন্দ্রাণীর রাগ তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে জ্বলিতে লাগিল।

পরিশিষ্ট।

এমন সময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল বাবুদের বাড়ির খাজাঞ্চি আসিয়াছে। অম্বিকা মনে করিলেন, বিনোদ স্বাভাবিক চক্ষু-লজ্জাবশতঃ খাজাঞ্চির মুখ দিয়া তাঁহাকে কাজ হইতে জবাব দিয়া পাঠাইয়াছেন। সেই জন্য নিজেই একখানি ইস্তফাপত্র লিখিয়া খাজাঞ্চির হস্তে গিয়া দিলেন।

খাজাঞ্চি তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়া কহিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে?

তদুত্তরে শুনিলেন, যখন হইতে অম্বিকাচরণের সতর্কতা-বশতঃ খাজাঞ্চিখানা হইতে বিনোদের টাকা লওয়া বন্ধ হইয়াছে তখন হইতে বিনোদ নানা স্থান হইতে গোপনে বিস্তর টাকা ধার লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটার পর আর একটা ব্যবসা ফাঁদিয়া সে যতই প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল ততই তাহার রোখ্ চড়িয়া যাইতেছিল—ততই নূতন নূতন অসম্ভব উপায়ে আপন ক্ষতি নিবারণের চেষ্টা করিয়া অবশেষে আকণ্ঠ ঋণে নিমগ্ন হইয়াছে। অম্বিকাচরণ যখন পীড়িত ছিলেন তখন বিনোদ সেই সুযোগে তহবিল হইতে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইয়াছে। বাঁকাগাড়ি পরগণা অনেককাল হইতেই পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের নিকট রেহেনে আবদ্ধ; সে এ পর্য্যন্ত টাকার জন্য কোন প্রকার তাগাদা না দিয়া অনেক টাকা সুদ জমিতে দিয়াছে, এখন সময় বুঝিয়া হঠাৎ ডিক্রী করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। এই ত বিপদ!

শুনিয়া অম্বিকাচরণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আজ কিছুই ভেবে উঠতে পার্‌চিনে—কাল এর পরামর্শ করা যাবে।" খাজাঞ্চি যখন বিদায় লইতে উঠিলেন তখন অম্বিকা তাঁহার ইস্তফাপত্র চাহিয়া লইলেন।

অন্তঃপুরে আসিয়া অম্বিকা ইন্দ্রাণীকে সকল কথা বিস্তা-

রিত জানাইয়া কহিলেন—বিনোদের এ অবস্থায় ত আমি কাজ ছেড়ে দিতে পারিনে।

ইন্দ্রাণী অনেকক্ষণ প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া রহিল—অবশেষে অন্তরের সমস্ত বিরোধদ্বন্দ্ব সবলে দলন করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—না, এখন ছাড়তে পার না।

তাহার পরে কোথায় টাকা কোথায় টাকা করিয়া সন্ধান পড়িয়া গেল—যথেষ্ট পরিমাণে টাকা আর জুটে না। অন্তঃপুর হইতে গহনাগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য অম্বিকা বিনোদকে পরামর্শ দিলেন। ইতিপূর্ব্বে ব্যবসায় উপলক্ষে বিনোদ সে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কখন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এবারে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া, অনেক দীনতা স্বীকার করিয়া গহনাগুলি ভিক্ষা চাহিলেন। নয়নতারা কিছুতেই দিলেন না;—তিনি মনে করিলেন, তাঁহার চারিদিক হইতে সকলি খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে; এখন এই গহনাগুলি তাঁহার একমাত্র শেষ অবলম্বনস্থল—এবং ইহা তিনি অন্তিম আগ্রহ সহকারে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিলেন।

যখন কোথা হইতেও কোন টাকা পাওয়া গেল না, তখন ইন্দ্রাণীর প্রতিহিংসা-ভ্রূকুটির উপরে একটা তীব্র আনন্দের জ্যোতিঃ পতিত হইল। সে তাহার স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা ত করিয়াছ এখন তুমি ক্ষান্ত হও, যাহা হইবার তা হউক।

স্বামীর অবমাননায় উদ্দীপ্ত সতীর রোষানল এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, দেখিয়া অম্বিকা মনে মনে হাসিলেন। বিপদের দিনে অসহায় বালকের ন্যায় বিনোদ তাঁহার উপরে এমন একান্ত নির্ভর করিয়া আছে যে, তাহার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইয়াছে—এখন তাহাকে তিনি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি মনে করিতেছিলেন, তাঁহার নিজের বিষয় আবদ্ধ রাখিয়া টাকা উঠাইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী তাঁহাকে মাথার দিব্য দিয়া বলিল, ইহাতে আর তুমি হাত দিতে পারিবে না।

অম্বিকাচরণ বড় ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন। তিনি ইন্দ্রাণীকে আস্তে আস্তে বুঝাইবার যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন ইন্দ্রাণী কিছুতেই তাঁহাকে কথা কহিতে দিল না। অবশেষে অম্বিকা কিছু বিমর্ষ হইয়া গম্ভীর হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

তখন ইন্দ্রাণী লোহার সিন্দুক খুলিয়া তাহার সমস্ত গহনা একটি বৃহৎ থালায় স্তূপাকার করিল এবং সেই গুরুভার থালাটি বহুকষ্টে দুই হস্তে তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহার স্বামীর পায়ের কাছে রাখিল।

পিতামহের একমাত্র স্নেহের ধন ইন্দ্রাণী পিতামহের নিকট হইতে জন্মাবধি বৎসরে বৎসরে অনেক বহুমূল্য অলঙ্কার উপহার পাইয়া আসিয়াছে; মিতাচারী স্বামীরও জীবনের অধিকাংশ সঞ্চয় এই সন্তানহীন রমণীর ভাণ্ডারে

অলঙ্কাররূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। সেই সমস্ত স্বর্ণ মাণিক্য স্বামীর নিকট উপস্থিত করিয়া ইন্দ্রাণী কহিল—আমার এই গহনাগুলি দিয়া আমার পিতামহের দত্ত দান উদ্ধার করিয়া আমি পুনর্ব্বার তাঁহার প্রভুবংশকে দান করিব।

এই বলিয়া সে সজল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মস্তক নত করিয়া কল্পনা করিল, তাহার সেই বিরলশুভ্রকেশধারী, সরলসুন্দর-মুখচ্ছবি, শান্তস্নেহহাস্যময়, ধী-প্রদীপ্ত উজ্জ্বলগৌরকান্তি বৃদ্ধ পিতামহ এই মুহূর্ত্তে এখানে উপস্থিত আছেন, এবং তাহার নত মস্তকে শীতল স্নেহহস্ত রাখিয়া তাহাকে নীরবে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

বাঁকাগাড়ি পরগণা পুনশ্চ ক্রয় হইয়া গেলে, তখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গতভূষণা ইন্দ্রাণী আবার নয়নতারার অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণে গমন করিল; আর তাহার মনে কোন অপমান-বেদনা রহিল না।

ক্ষুধিত পাষাণ।

আমি এবং আমার আত্মীয় পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিলাম এমন সময় রেলগাড়িতে বাবুটির সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আরও ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়। পৃথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন যেন তাঁহার সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন। বিশ্বসংসারের ভিতরে ভিতরে যে এমন সকল অশ্রুতপূর্ব্ব নিগূঢ় ঘটনা ঘটিতেছিল, রশিয়ান্‌রা যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইংরাজদের যে এমন সকল গোপন মৎলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা খিচুড়ি পাকিয়া উঠিয়াছে, এ সমস্ত কিছুই না জানিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম। আমাদের নবপরিচিত আলাপীটি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your newspapers. আমরা এই প্রথম ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, সুতরাং লোকটির রকম-সকম দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। লোকটা সামান্য উপলক্ষে কখন বিজ্ঞান বলে, কখনো বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনো পার্সি বয়েৎ আওড়াইতে থাকে; বিজ্ঞান, বেদ এবং পার্সিভাষায় আমাদের কোনরূপ

অধিকার না থাকাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এমন কি, আমার থিয়সফিষ্ট্ আত্মীয়টির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাত্রীটির সহিত কোন এক রকমের অলৌকিক ব্যাপারের কিছু একটা যোগ আছে; কোন একটা অপূর্ব্ব ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্ অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা কিছু। তিনি এই অসামান্য লোকের সমস্ত সামান্য কথাও ভক্তিবিহ্বল মুগ্ধভাবে শুনিতেছিলেন এবং গোপনে নোট করিয়া লইতেছিলেন; আমার ভাবে বোধ হইল, অসামান্য ব্যক্তিটিও গোপনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং কিছু খুসী হইয়াছিলেন।

গাড়িটি আসিয়া জংশনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষায় ওয়েটিংরুমে সমবেত হইলাম। তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। পথের মধ্যে একটা কি ব্যাঘাত হওয়াতে গাড়ি অনেক বিলম্বে আসিবে শুনিলাম। আমি ইতিমধ্যে টেবিলের উপর বিছানা পাতিয়া ঘুমাইব স্থির করিয়াছি এমন সময়ে সেই অসামান্য ব্যক্তিটি নিম্নলিখিত গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। সে রাত্রে আমার আর ঘুম হইল না।

রাজ্যচালনা সম্বন্ধে দুই একটা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে আমি জুনাগড়ের কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া হাইদ্রাবাদে যখন নিজাম সরকারে প্রবেশ করিলাম তখন আমাকে অল্পবয়স্ক ও মজবুৎ

লোক দেখিয়া প্রথমেই বরীচে তুলার মাশুল আদায়ে নিযুক্ত করিয়া দিল।

বরীচ্ জায়গাটি বড় রমণীয়। নির্জ্জন পাহাড়ের নীচে বড় বড় বনের ভিতর দিয়া শুস্তা নদীটি (সংস্কৃত "স্বচ্ছতোয়া"র অপভ্রংশ) উপল-মুখরিত পথে নিপুণা নর্ত্তকীর মত পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাঁধানো দেড়শত সোপানময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে একটি শ্বেত প্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপদমূলে একাকী দাঁড়াইয়া আছে—নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দূরে।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয় শা মামুদ্ ভোগ-বিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জ্জনস্থানে নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন। তখন ইহার স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধী জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকর-শীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্ম্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্ম্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্ব্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া সেতার কোলে দ্রাক্ষাবনের গজল্ গান করিত।

এখন আর সে ফোয়ারা খেলে না, সে গান নাই শাদা পাথরের উপর শুভ্র চরণের সুন্দর আঘাত পড়ে না—এখন ইহা আমাদের মত নির্জ্জনবাসপীড়িত সঙ্গিনীহীন মাশুল-

কালেক্টরের অতি বৃহৎ এবং অতি শূন্য বাসস্থান। কিন্তু আপি-সের বৃদ্ধকেরাণী করিম খাঁ আমাকে এই প্রাসাদে বাস করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, ইচ্ছা হয়, দিনের বেলা থাকিবেন কিন্তু কখনো এখানে রাত্রিযাপন করিবেন না। আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। ভৃত্যেরা বলিল, তাহারা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করিবে কিন্তু রাত্রে এখানে থাকিবে না। আমি বলিলাম, তথাস্তু। এ বাড়ির এমন বদ্‌নাম ছিল যে, রাত্রে চোরও এখানে আসিতে সাহস করিত না।

প্রথম প্রথম আসিয়া এই পরিত্যক্ত পাষাণপ্রাসাদের বিজ-নতা আমার বুকের উপর যেন একটা ভয়ঙ্কর ভারের মত চাপিয়া থাকিত আমি যতটা পারিতাম বাহিরে থাকিয়া অবিশ্রাম কাজ কর্ম্ম করিয়া রাত্রে ঘরে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে নিদ্রা দিতাম।

কিন্তু সপ্তাহ খানেক না যাইতেই বাড়িটার এক অপূর্ব্ব নেশা আমাকে ক্রমশঃ আক্রমণ করিয়া ধরিতে লাগিল। আমার সে অবস্থা বর্ণনা করাও কঠিন এবং সে কথা লোককে বিশ্বাস করানও শক্ত। সমস্ত বাড়িটা একটা সজীব পদার্থের মত আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহ-রসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।

বোধ হয় এ বাড়িতে পদার্পণমাত্রেই এ প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছিল—কিন্তু আমি যে দিন সচেতন ভাবে প্রথম ইহার সূত্রপাত অনুভব করি, সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তখন গ্রীষ্মকালের আরম্ভে বাজার নরম; আমার হাতে কোন কাজ ছিল না। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে আমি সেই নদী-তীরে ঘাটের নিম্নতলে একটা আরাম-কেদারা লইয়া বসিয়াছি। তখন শুস্তানদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে;—ওপারে অনেকখানি বালুতট অপরাহ্ণের আভায় রঙীন্ হইয়া উঠিয়াছে, এপারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে নুড়িগুলি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ে বন-তুলশী, পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়া-ছিল।

সূর্য্য যখনি গিরিশিখরের অন্তরালে অবতীর্ণ হইল তৎ-ক্ষণাৎ দিবসের নাট্যশালায় একটা দীর্ঘ ছায়া-যবনিকা পড়িয়া গেল;—এখানে পর্ব্বতের ব্যবধান থাকাতে সূর্য্যাস্তের সময় আলো আঁধারের সম্মিলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঘোড়ায় চড়িয়া একবার ছুটিয়া বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া উঠিব উঠিব করিতেছি, এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম,—কেহ নাই।

ইন্দ্রিয়ের ভ্রম মনে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া বসিতেই, একে-বারে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল—যেন অনেকে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ঈষৎ ভয়ের সহিত এক অপরূপ পুলক মিশ্রিত হইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ পরি-পূর্ণ করিয়া তুলিল। যদিও আমার সম্মুখে কোন মূর্ত্তি ছিল না

তথাপি স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে হইল, যে, এই গ্রীষ্মের সায়াহ্নে একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শুস্তার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নদী-তীরে, নির্জ্জন প্রাসাদে কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না তথাপি আমি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম নির্ঝরের শত ধারার মত সকৌতুক কলহাস্যের সহিত পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল। আমাকে যেন লক্ষ্য করিল না। তাহারা যেমন আমার নিকট অদৃশ্য, আমিও যেন সেইরূপ তাহাদের নিকট অদৃশ্য। নদী পূর্ব্ববৎ স্থির ছিল, কিন্তু আমার নিকট স্পষ্ট বোধ হইল, স্বচ্ছতোয়ার অগভীর স্রোত অনেকগুলি বলয়শিঞ্জিত বাহুবিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, হাসিয়া হাসিয়া সখীগণ পরস্পরের গায়ে জল ছুঁড়িয়া মারিতেছে, এবং সন্তরণকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মুক্তামুষ্টির মত আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।

আমার বক্ষের মধ্যে এক প্রকার কম্পন হইতে লাগিল; সে উত্তেজনা ভয়ের, কি আনন্দের, কি কৌতূহলের, ঠিক বলিতে পারি না। বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল ভাল করিয়া দেখি কিন্তু সম্মুখে দেখিবার কিছুই ছিল না; মনে হইল, ভাল করিয়া কান পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই স্পষ্ট শোনা যাইবে,—কিন্তু একান্ত মনে কান পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব শোনা যায়। মনে হইল আড়াই শত বৎসরের কৃষ্ণ-বর্ণ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে দুলিতেছে—ভয়ে ভয়ে একটি

ধার তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করি—সেখানে বৃহৎ সভা বসিয়াছে কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ গুমট্ ভাঙ্গিয়া হুহু করিয়া একটা বাতাস দিল—শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মত কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্ত্তে এক সঙ্গে মর্ম্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নই বল আর সত্যই বল, আড়াই শত বৎসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমার সম্মুখে যে এক অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া শুস্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নিষ্কর্ষণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন আমার বড় আশঙ্কা হইল, যে, হঠাৎ বুঝি নির্জ্জন পাইয়া কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে আসিয়া ভর করিলেন; আমি বেচারা তুলার মাশুল আদায় করিয়া খাটিয়া খাই, সর্ব্বনাশিনী এইবার বুঝি আমার মুণ্ডপাত করিতে আসিলেন। ভাবিলাম ভাল করিয়া আহার করিতে হইবে;—শূন্য উদরেই সকলপ্রকার দুরারোগ্য রোগ আসিয়া চাপিয়া ধরে। আমার

পাচকটিকে ডাকিয়া প্রচুর ঘৃতপক্ক মস্‌লা-সুগন্ধি রীতিমত মোগ্‌লাইখানা হুকুম করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত ব্যাপারটি পরম হাস্যজনক বলিয়া বোধ হইল। আনন্দমনে, সাহেবের মত সোলাটুপি পরিয়া নিজের হাতে গাড়ি হাঁকাইয়া গড়্ গড়্ শব্দে আপন তদন্তকার্য্যে চলিয়া গেলাম। সে দিন ত্রৈমাসিক রিপোর্ট্ লিখিবার দিন থাকাতে বিলম্বে বাড়ি ফিরিবার কথা। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাকে বাড়ির দিকে টানিতে লাগিল। কে টানিতে লাগিল বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হইল আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। মনে হইল সকলে বসিয়া আছে। রিপোর্ট অসমাপ্ত রাখিয়া সোলার টুপি মাথায় দিয়া সেই সন্ধ্যাধূসর তরুচ্ছায়াঘন নির্জ্জন পথ রথচক্রশব্দে সচকিত করিয়া সেই অন্ধকার শৈলান্তবর্ত্তী নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

সিঁড়ির উপরে সম্মুখের ঘরটি অতি বৃহৎ। তিন সারি বড় বড় থামের উপর কারুকার্য্যখচিত খিলানে বিস্তীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকাণ্ড ঘরটি আপনার বিপুল শূন্যতা ভরে অহর্নিশি গম্‌গম্ করিতে থাকে। সে দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তখনো প্রদীপ জ্বালানো হয় নাই। দরজা ঠেলিয়া আমি সেই বৃহৎ ঘরে যেমন প্রবেশ করিলাম অমনি মনে হইল ঘরের মধ্যে যেন ভারি একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল—যেন হঠাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া চারিদিকের দরজা জান্‌লা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে

কোন্ দিকে পালাইল তাহার ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যেন বহুদিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম—ঝর্ঝর শব্দে ফোয়ারার জল শাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কি সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিত, কোথাও বা নূপুরের নিক্কণ, কখন বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিক দোলকগুলির ঠুনঠুন ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুল্‌বুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দ্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার এমন একটা মোহ উপস্থিত হইল, মনে হইল, এই অস্পৃশ্য অগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা মরীচিকা। আমি যে আমি—অর্থাৎ আমি যে শ্রীযুক্ত অমুক, ৺ অমুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুলার মাশুল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে চারশো টাকা বেতন পাই, আমি যে সোলার টুপি এবং খাটো কোর্ত্তা পরিয়া টম্‌টম্ হাঁকাইয়া আপিস্ করিতে যাই, এ সমস্তই আমার কাছে এমন অদ্ভুত হাস্যকর

অমূলক মিথ্যা কথা বলিয়া বোধ হইল যে আমি সেই বিশাল নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তখনি আমার মুসলমান ভৃত্য প্রজ্জ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাকে পাগল মনে করিল কি না জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হইল যে, আমি ৺অমুকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অমুক নাথ বটে, ইহাও মনে করিলাম যে, জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অমূর্ত্ত ফোয়ারা নিত্যকাল উৎসারিত ও অদৃশ্য অঙ্গুলির আঘাতে কোন মায়া-সেতারে অনন্ত রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে কি না তাহা আমাদের মহাকবি এবং কবি-বরেরাই বলিতে পারেন কিন্তু এ কথা নিশ্চয় সত্য যে, আমি বরীচের হাটে তুলার মাশুল আদায় করিয়া মাসে সাড়ে চার শো টাকা বেতন লইয়া থাকি। তখন আবার আমার পূর্ব্ব-ক্ষণের অদ্ভুত মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসীন্-প্রদীপ্ত ক্যাম্প টেবিলের কাছে খবরের কাগজ লইয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলাম।

খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগ্‌লাই খানা খাইয়া একটি ক্ষুদ্র কোণের ঘরে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। আমার সম্মুখবর্ত্তী খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার বনবেষ্টিত অরালী পর্ব্বতের উর্দ্ধদেশে একটি অত্যু-জ্জ্বল নক্ষত্র সহস্র কোটী যোজন দূর আকাশ হইতে সেই অতি

তুচ্ছ ক্যাম্পখাটের উপর শ্রীযুক্ত মাশুল-কালেক্টরকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল,—ইহাতে আমি বিস্ময় ও কৌতুক অনুভব করিতে করিতে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম তাহাও জানি না। সহসা এক সময় শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলাম ;—ঘরে যে কোন শব্দ হইয়াছিল তাহা নহে, কোন যে লোক প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকার পর্ব্বতের উপর হইতে অনিমেষ নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রালোক অনধিকারসঙ্কুচিত ম্লানভাবে আমার বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়াছে।

কোন লোককেই দেখিলাম না তবু যেন আমার স্পষ্ট মনে হইল কে একজন আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে। আমি জাগিয়া উঠিতেই সে কোন কথা না বলিয়া কেবল যেন তাহার অঙ্গুরীখচিত পাঁচ অঙ্গুলির ইঙ্গিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিল।

আমি অত্যন্ত চুপি চুপি উঠিলাম। যদিও সেই শতকক্ষ-প্রকোষ্ঠময় প্রকাণ্ড শূন্যতাময়, নিদ্রিত ধ্বনি এবং সজাগ প্রতিধ্বনিময় বৃহৎ প্রাসাদে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণীও ছিল না তথাপি পদে পদে ভয় হইতে লাগিল পাছে কেহ জাগিয়া উঠে। প্রাসাদের অধিকাংশ ঘর রুদ্ধ থাকিত, এবং সে সকল ঘরে আমি কখনও যাই নাই।

সে রাত্রে নিঃশব্দপদক্ষেপে সংযত নিশ্বাসে সেই অদৃশ্য

আহ্বানরূপিণীর অনুসরণ করিয়া আমি যে কোথায় যাইতে-ছিলাম আজ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। কত সঙ্কীর্ণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গম্ভীর নিস্তব্ধ সুবৃহৎ সভাগৃহ, কত রুদ্ধবায়ু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই।

আমার অদৃশ্য দূতীটিকে যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই, তথাপি তাহার মূর্ত্তি আমার মনের অগোচর ছিল না। আরব রমণী, ঝোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া শ্বেতপ্রস্তররচিতবৎ কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে, টুপির প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি সূক্ষ্ম বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবন্ধে একটি বাঁকা ছুরি বাঁধা।

আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিমগ্ন বোগ্‌দাদের নির্ব্বাপিতদীপ সঙ্কীর্ণ পথে কোন এক সঙ্কটশঙ্কিল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।

অবশেষে আমার দূতী একটি ঘননীল পর্দ্দার সম্মুখে সহসা থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া যেন নিম্নে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। নিম্নে কিছুই ছিল না, কিন্তু ভয়ে আমার বক্ষের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। আমি অনুভব করিলাম, সেই পর্দ্দার সম্মুখে ভূমিতলে কিংখাবের সাজপরা একটি ভীষণ কাফ্রী খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া দুই পা ছড়াইয়া দিয়া

বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। দূতী লঘুগতিতে তাহার দুই পা ডিঙ্গাইয়া পর্দ্দার এক প্রান্তদেশ তুলিয়া ধরিল।

ভিতর হইতে একটি পারস্য গালিচা পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল। তক্তের উপরে কে বসিয়া আছে দেখা গেল না— কেবল জাফ্রান্ রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির চটি পরা দুইখানি ক্ষুদ্র সুন্দর চরণ গোলাপী মখ্মল্ আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের একপার্শ্বে একটি নীলাভ স্ফটিক পাত্রে কতকগুলি আপেল, নাশ্পাতী, নারাঙ্গী এবং প্রচুর আঙুরের গুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে দুইটি ছোট পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা অপূর্ব্ব ধূপের একপ্রকার মাদক সুগন্ধি ধূম্র আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

আমি কম্পিত বক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদদ্বয় যেমন লঙ্ঘন করিতে গেলাম, অমনি সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল— তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাথরের মেজে শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।

সহসা একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া দেখিলাম, আমার সেই ক্যাম্প্ খাটের উপরে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বসিয়া আছি—ভোরের আলোয় কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড-চাঁদ জাগরণক্লিষ্ট রোগীর মত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেছে—এবং আমাদের পাগ্লা মেহের আলি তাহার প্রাত্যহিক প্রথা অনুসারে প্রত্যূষের

জনশূন্য পথে "তফাৎ যাও" "তফাৎ যাও" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে।

এইরূপে আমার আরব্য উপন্যাসের একরাত্রি অকস্মাৎ শেষ হইল—কিন্তু এখনো এক সহস্র রজনী বাকি আছে।

আমার দিনের সহিত রাত্রের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় শ্রান্ত ক্লান্তদেহে কর্ম্ম করিতে যাইতাম, এবং শূন্যস্বপ্নময়ী মোহময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম—আবার সন্ধ্যার পরে আমার দিনের বেলাকার কর্ম্মবদ্ধ অস্তিত্বকে অত্যন্ত তুচ্ছ, মিথ্যা এবং হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।

সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্ব্বেকার কোন এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর একটা অপূর্ব্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতী খাটো কোর্ত্তা, এবং আঁট প্যাণ্ট্‌লুনে আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখ্‌মলের ফেজ্ তুলিয়া, ঢিলা পায়জামা, ফুলকাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া রঙীন্ রুমালে আতর মাখিয়া বহুযত্নে সাজ করিতাম এবং সিগারেট্ ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপূর্ণ বহুকুণ্ডলায়িত বৃহৎ আল্‌বোলা লইয়া এক উচ্চগদিবিশিষ্ট বড় কেদারায় বসিতাম। যেন রাত্রে কোন এক অপূর্ব্ব প্রিয়সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।

তাহার পর অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইত ততই কি যে

এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক যেন একটা চমৎকার গল্পের কতকগুলি ছিন্ন অংশ বসন্তের আকস্মিক বাতাসে এই বৃহৎ প্রাসাদের বিচিত্র ঘরগুলির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত। খানিকটা দূর পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত তাহার পরে আর শেষ দেখা যাইত না। আমিও সেই ঘূর্ণ্যমান বিচ্ছিন্ন অংশগুলির অনুসরণ করিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

এই খণ্ডস্বপ্নের আবর্ত্তের মধ্যে,—এই ক্বচিৎ হেনার গন্ধ, ক্বচিৎ সেতারের শব্দ, ক্বচিৎ সুরভি জলশীকরমিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মত চকিতে দেখিতে পাইতাম। তাহারি জাফ্‌রান্‌ রঙের পায়জামা এবং দুটি শুভ্র রক্তিম কোমল পায়ে বক্রশীর্ষ জরির চটিপরা, বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির ফুলকাটা কাঁচলি আবদ্ধ, মাথায় একটি লালটুপি এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শুভ্র ললাট এবং কপোল বেষ্টন করিয়াছে।

সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতিরাত্রে নিদ্রার রসাতলরাজ্যে স্বপ্নের জটিলপথ-সঙ্কুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।

এক একদিন সন্ধ্যার সময় বড় আয়নার দুই দিকে দুই বাতি জ্বালাইয়া যত্নপূর্ব্বক শাহজাদার মত সাজ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইতাম আয়নায় আমার প্রতি-

বিম্বের পার্শ্বে ক্ষণিকের জন্য সেই তরুণী ইরাণীর ছায়া আসিয়া পড়িল;—পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষুতারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহ-কটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুতবেগে উর্দ্ধাভিমুখে আবর্ত্তিত করিয়া, মুহূর্ত্ত-কালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল। গিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটা উদ্দাম বায়ুর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত;—আমি সাজসজ্জা ছাড়িয়া দিয়া বেশগৃহের প্রান্তবর্ত্তী শয্যাতলে পুলকিতদেহে মুদ্রিতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম—আমার চারিদিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই অরালী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল করস্পর্শ নিভৃত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, কানের কাছে অনেক কলগুঞ্জন শুনিতে পাইতাম, আমার কপালের উপর সুগন্ধ নিশ্বাস আসিয়া পড়িত, এবং আমার কপোলে একটি মৃদুসৌরভরমণীয় সুকোমল ওড়্না বারম্বার উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া স্পর্শ করিত। অল্পে অল্পে যেন একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার মাদক বেষ্টনে আমার সর্ব্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।

একদিন অপরাহ্ণে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইব সংকল্প করিলাম—কে আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল জানি না—কিন্তু সে দিন নিষেধ মানিলাম না। একটা কাষ্ঠদণ্ডে আমার সাহেবী হ্যাট্ এবং খাটো কোর্ত্তা ঝুলিতেছিল, পাড়িয়া লইয়া পরিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় শুস্তানদীর বালী এবং অরালী পর্ব্বতের শুষ্ক পল্লবরাশির ধ্বজা তুলিয়া হঠাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণাবাতাস আমার সেই কোর্ত্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিল এবং একটা অত্যন্ত সুমিষ্ট কলহাস্য সেই হাওয়ার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে কৌতুকের সমস্ত পর্দ্দায় পর্দ্দায় আঘাত করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উঠিয়া সূর্য্যাস্তলোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।

সে দিন আর ঘোড়ায় চড়া হইল না এবং তাহার পরদিন হইতে সেই কৌতুকাবহ খাটো কোর্ত্তা এবং সাহেবী হ্যাট্‌পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।

আবার সেই দিন অর্দ্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম, কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে—যেন আমার খাটের নীচে, মেঝের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবর্ত্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের

ভিতর দিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্য্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও! আমাকে উদ্ধার কর!

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণ্যমান পরিবর্ত্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জ্জূরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে! তোমাকে কোন বেদুয়ীন্ দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মত মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপর চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল! সেখানে কোন্ বাদ্‌শাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া তোমাকে সোণার শিবিকায় বসাইয়া প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল! সেখানে সে কি ইতিহাস! সেই সারঙ্গীর সঙ্গীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক্, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত! কি অসীম ঐশ্বর্য্য, কি অনন্ত কারাগার! দুইদিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে শাহেন্ শা বাদ্‌শা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে;—বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মত

হাব্‌শী, দেবদূতের মত সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষ্যা-ফেনিল ষড়-যন্ত্রসঙ্কুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে ?

এমন সময় হঠাৎ সেই পাগ্‌লা মেহের আলি চীৎকার করিয়া উঠিল—"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও ! সব ঝুঁট্ হ্যায় সব ঝুঁট্ হ্যায় !" চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে ; চাপ্‌রাশি ডাকের চিঠিপত্র লইয়া আমার হাতে দিল এবং পাচক আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল আজ কিরূপ খানা প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমি কহিলাম, না, আর এ বাড়িতে থাকা হয় না। সেই দিনই আমার জিনিষপত্র তুলিয়া আপিস-ঘরে গিয়া উঠিলাম। আপিসের বৃদ্ধ কেরাণী করীম্ খাঁ আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল। আমি তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া কোন উত্তর না করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম।

যত বিকাল হইয়া আসিতে লাগিল ততই অন্যমনস্ক হইতে লাগিলাম—মনে হইতে লাগিল এখনি কোথায় যাইবার আছে—তুলার হিসাব পরীক্ষার কাজটা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হইল, নিজামের নিজামৎও আমার কাছে বেশী কিছু বোধ হইল না—যাহা কিছু বর্ত্তমান, যাহা কিছু আমার চারি দিকে চলিতেছে ফিরিতেছে খাটিতেছে খাইতেছে সমস্তই

আমার কাছে অত্যন্ত দীন, অর্থহীন, অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

আমি কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, বৃহৎ খাতা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ টম্‌টম্ চড়িয়া ছুটিলাম। দেখিলাম, টম্‌টম্ ঠিক গোধূলি মুহূর্ত্তে আপনিই সেই পাষাণপ্রাসাদের দ্বারের কাছে গিয়া থামিল। দ্রুতপদে সিঁড়িগুলি উত্তীর্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আজ সমস্ত নিস্তব্ধ। অন্ধকার ঘরগুলি যেন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া আছে। অনুতাপে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু কাহাকে জানাইব, কাহার নিকট মার্জ্জনা চাহিব খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি শূন্যমনে অন্ধকার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইচ্ছা করিতে লাগিল একখানা যন্ত্র হাতে লইয়া কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া গান গাহি, বলি, হে বহ্নি! যে পতঙ্গ তোমাকে ফেলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আবার মরিবার জন্য আসিয়াছে! এবার তাহাকে মার্জ্জনা কর, তাহার দুই পক্ষ দগ্ধ করিয়া দাও, তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেল!

হঠাৎ উপর হইতে আমার কপালে দুই ফোঁটা অশ্রুজল পড়িল। সে দিন অরালী পর্ব্বতের চূড়ায় ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। অন্ধকার অরণ্য এবং শুস্তার মসীবর্ণ জল একটা ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়াছিল। জলস্থলআকাশ সহসা শিহরিয়া উঠিল; এবং অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দন্ত-

বিকশিত ঝড় শৃঙ্খলচ্ছিন্ন উন্মাদের মত পথহীন সুদূর বনের ভিতর দিয়া আর্ত্ত চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। প্রাসাদের বড় বড় শূন্য ঘরগুলা সমস্ত দ্বার আছড়াইয়া তীব্র বেদনায় হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ ভৃত্যগণ সকলেই আপিস্-ঘরে ছিল, এখানে আলো জ্বালাইবার কেহ ছিল না। সেই মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম—একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ় বদ্ধমুষ্টিতে আপনার আলুলায়িত কেশজাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে, তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনও সে শুষ্ক তীব্র অট্টহাস্যে হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনও ফুলিয়া ফুলিয়া ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষে আঘাত করিতেছে, মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে এবং মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে।

সমস্ত রাত্রি ঝড়ও থামে না ক্রন্দনও থামে না। আমি নিষ্ফল পরিতাপে ঘরে ঘরে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কোথাও নাই, কাহাকে সান্ত্বনা করিব? এই প্রচণ্ড অভিমান কাহার? এই অশান্ত আক্ষেপ কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে?

পাগল চীৎকার করিয়া উঠিল, "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! সব ঝুঁট্ হায়, সব ঝুঁট্ হায়!"

দেখিলাম ভোর হইয়াছে এবং মেহেরআলি এই ঘোর দুর্য্যোগের দিনেও যথানিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভ্যস্ত চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ আমার মনে হইল, হয় ত ঐ মেহেরআলিও আমার মত এক সময় এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিল, এখন পাগল হইয়া বাহির হইয়াও এই পাষাণ রাক্ষসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ প্রত্যূষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগ্‌লার নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেহেরআলি, ক্যা ঝুঁট্ হায়রে?"

সে আমার কথায় কোন উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণ্যমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বাড়ির চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কেবল প্রাণপণে নিজেকে সতর্ক করিবার জন্য বারম্বার বলিতে লাগিল—"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, সব ঝুঁট্ হায়, সব ঝুঁট্ হায়!"

আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মত আপিসে গিয়া করীম্‌খাঁকে ডাকিয়া বলিলাম, ইহার অর্থ কি আমায় খুলিয়া বল।

বৃদ্ধ যাহা কহিল তাহার মর্ম্মার্থ এই, এক সময় ঐ প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলো-

ড়িত হইত—সেই সকল চিত্তদাহে, সেই সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত্ত তৃষার্ত্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মত খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা ত্রিরাত্রি ঐ প্রাসাদে বাস করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কেবল মেহেরআলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্য্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার উদ্ধারের কি কোন পথ নাই?

বৃদ্ধ কহিল, একটি মাত্র উপায় আছে তাহা অত্যন্ত দুরূহ। তাহা তোমাকে বলিতেছি—কিন্তু তৎপূর্ব্বে ঐ গুল্‌বাগের একটি ইরাণী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক। তেমন আশ্চর্য্য এবং তেমন হৃদয়বিদারণ ঘটনা সংসারে আর কখন ঘটে নাই।

এমন সময় কুলিরা আসিয়া খবর দিল—গাড়ি আসিতেছে। এত শীঘ্র? তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বাঁধিতে বাঁধিতে গাড়ি আসিয়া পড়িল। সে গাড়ির ফাষ্ট ক্লাসে একজন সুপ্তোত্থিত ইংরাজ জান্‌লা হইতে মুখ বাড়াইয়া ষ্টেশনের নাম পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের সহযাত্রী বন্ধুটিকে দেখিয়াই "হ্যালো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং নিজের

গাড়িতে তুলিয়া লইল। আমরা সেকেণ্ড্ ক্লাসে উঠিলাম। বাবুটি কে খবর পাইলাম না, গল্পেরও শেষ শোনা হইল না।

আমি বলিলাম, লোকটা আমাদিগকে বোকার মত দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল—গল্পটা আগাগোড়া বানানো।

এই তর্কের উপলক্ষে আমার থিয়সফিষ্ট্ আত্মীয়টির সহিত আমার জন্মের মত বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে।

অতিথি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলাল বাবু নৌকা করিয়া সপরিবারে স্বদেশে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে মধ্যাহ্নে নদীতীরের এক গঞ্জের নিকট নৌকা বাঁধিয়া পাকের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণ বালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু তোমরা যাচ্চ কোথায়?—প্রশ্নকর্ত্তার বয়স ১৫।১৬র অধিক হইবে না।

মতিবাবু উত্তর করিলেন, কাঁঠালে।

ব্রাহ্মণবালক কহিল, আমাকে পথের মধ্যে নন্দীগাঁয়ে নাবিয়ে দিতে পার?

বাবু সম্মতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি?

ব্রাহ্মণ বালক কহিল, 'আমার নাম তারাপদ।'

গৌরবর্ণ ছেলেটিকে বড় সুন্দর দেখিতে। বড় বড় চক্ষু এবং প্রসন্ন হাস্যময় ওষ্ঠাধরে একটি সুললিত সৌকুমার্য্য প্রকাশ পাইতেছে। পরিধানে একখানি মলিন ধুতি। অনাবৃত দেহখানি সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত; কোন শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁৎ নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছে। যেন সে

পূর্ব্বজন্মে তাপস বালক ছিল, এবং নির্ম্মল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুল পরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মার্জ্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মতিলাল বাবু তাহাকে পরম স্নেহভরে কহিলেন, বাবা তুমি স্নান করে এস, এইখানেই আহারাদি হবে।

তারাপদ বলিল, রসুন্। বলিয়া তৎক্ষণাৎ অসঙ্কোচে রন্ধনের আয়োজনে যোগদান করিল। মতিলাল বাবুর চাকরটা ছিল হিন্দুস্থানী, মাছ কোটা প্রভৃতি কার্য্যে তাহার তেমন পটুত্ব ছিল না; তারাপদ তাহার কাজ নিজে লইয়া অল্পকালের মধ্যেই সুসম্পন্ন করিল এবং দুই একটা তরকারীও অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সহিত রন্ধন করিয়া দিল। পাককার্য্য শেষ হইলে তারাপদ নদীতে স্নান করিয়া বোঁচকা খুলিয়া একটি শুভ্র বস্ত্র পরিল; একটি ছোট কাঠের কাঁকই লইয়া মাথার বড় বড় চুল কপাল হইতে তুলিয়া গ্রীবার উপর ফেলিল এবং মার্জ্জিত পৈতার গোচ্ছা বক্ষে বিলম্বিত করিয়া নৌকায় মতিবাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

মতিবাবু তাহাকে নৌকার ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে মতিবাবুর স্ত্রী এবং তাঁহার নবমবর্ষীয়া এক কন্যা বসিয়াছিলেন। মতিবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া স্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন—মনে মনে কহিলেন আহা কাহার বাছা, কোথা হইতে আসিয়াছে—ইহার মা ইহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছে!—

যথাসময়ে মতিবাবু এবং এই ছেলেটির জন্য পাশাপাশি দুইখানি আসন পড়িল। ছেলেটি তেমন ভোজনপটু নহে; অন্নপূর্ণা তাহার স্বল্প আহার দেখিয়া মনে করিলেন সে লজ্জা করিতেছে; তাহাকে এটা ওটা খাইতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন; কিন্তু যখন সে আহার হইতে নিরস্ত হইল, তখন সে কোন অনুরোধ মানিল না। দেখা গেল, ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে, অথচ এমন সহজে করে যে, তাহাতে কোন প্রকার "জেদ্" অথবা "গোঁ" প্রকাশ পায় না। তাহার ব্যবহারে লজ্জার লক্ষণও লেশমাত্র দেখা গেল না।

সকলের আহারাদির পরে অন্নপূর্ণা তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার ইতিহাস জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তারিত বিবরণ কিছুই সংগ্রহ হইল না। মোট কথা এইটুকু জানা গেল, ছেলেটি সাত আট বৎসর বয়সেই স্বেচ্ছাক্রমে ঘর ছাড়িয়া পালাইয়া আসিয়াছে।

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, তোমার মা নাই?

তারাপদ কহিল—আছেন।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তোমাকে ভাল বাসেন না?

তারাপদ এই প্রশ্ন অত্যন্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, কেন ভালবাস্‌বেন না?

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, তবে তুমি তাঁকে ছেড়ে এলে যে?

তারাপদ কহিল, তাঁর আরও চারটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে আছে।

অন্নপূর্ণা বালকের এই অদ্ভুত উত্তরে ব্যথিত হইয়া কহি-লেন, ওমা, সে কি কথা! পাঁচটি আঙ্গুল আছে বলে কি একটি আঙ্গুল ত্যাগ করা যায়।

তারাপদর বয়স অল্প, তাহার ইতিহাসও সেই পরিমাণে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ছেলেটি সম্পূর্ণ নূতনতর। সে তাহার পিতামাতার চতুর্থ পুত্র, শৈশবেই পিতৃহীন হয়। বহু সন্তানের ঘরেও তারা-পদ সকলের অত্যন্ত আদরের ছিল;—মা ভাই বোন এবং পাড়ার সকলেরই নিকট হইতে সে অজস্র স্নেহ লাভ করিত। এমন কি, গুরুমহাশয়ও তাহাকে মারিত না—মারিলেও বাল-কের আত্মীয় পর সকলেই তাহাতে বেদনা বোধ করিত। এমন অবস্থায় তাহার গৃহত্যাগ করিবার কোনই কারণ ছিল না। যে উপেক্ষিত রোগা ছেলেটা সর্ব্বদাই চুরি-করা গাছের ফল এবং গৃহস্থ লোকদের নিকট তাহার চতুর্গুণ প্রতিফল খাইয়া বেড়ায় সেও তাহার পরিচিত গ্রামসীমার মধ্যে তাহার নির্য্যাতনকারিণী মার নিকট পড়িয়া রহিল আর সমস্ত গ্রামের এই আদরের ছেলে একটা বিদেশী যাত্রার দলের সহিত মিলিয়া অকাতর চিত্তে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

সকলে খোঁজ করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিল। তাহার মা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুজলে আর্দ্র করিয়া দিল, তাহার বোন্‌রা কাঁদিতে লাগিল; তাহার বড় ভাই পুরুষ অভিভাবকের কঠিন কর্ত্তব্য পালন উপলক্ষে তাহাকে মৃদুরকম শাসন করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে অনুতপ্ত চিত্তে

বিস্তর প্রশ্রয় এবং পুরস্কার দিল। পাড়ার মেয়েরা তাহাকে ঘরে ঘরে ডাকিয়া প্রচুরতর আদর এবং বহুতর প্রলোভনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বন্ধন, এমন কি স্নেহবন্ধনও তাহার সহিল না;—তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে;—সে যখনি দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বত্থগাছের তলে কোন্ দূর দেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে অথবা "বেদে"রা নদীতীরের পতিত মাঠে ছোট ছোট চাটাই বাঁধিয়া বাঁথারি ছুলিয়া চাঙারি নির্ম্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। উপরি উপরি দুই তিন বার পলায়নের পর তাহার আত্মীয়বর্গ এবং গ্রামের লোক তাহার আশা পরিত্যাগ করিল।

প্রথমে সে একটা যাত্রার দলের সঙ্গ লইয়াছিল। অধিকারী যখন তাহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিল এবং দলস্থ ছোটবড় সকলেরই যখন সে প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল, এমন কি, যে বাড়িতে যাত্রা হইত সে বাড়ির অধ্যক্ষগণ, বিশেষতঃ পুর-মহিলাবর্গ যখন বিশেষরূপে তাহাকে আহ্বান করিয়া সমাদর করিতে লাগিল, তখন একদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারাপদ হরিণশিশুর মত বন্ধনভীরু আবার হরিণেরই মত সঙ্গীতমুগ্ধ। যাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে

বিবাগী করিয়া দেয়। গানের সুরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্ব্বাঙ্গে আন্দোলন উপস্থিত হইত। যখন সে নিতান্ত শিশু ছিল তখনও সঙ্গীতসভায় সে যেরূপ সংযত গম্ভীর বয়স্কভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া বসিয়া বসিয়া দুলিত, দেখিয়া প্রবীণ লোকের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইত। কেবল সঙ্গীত কেন, গাছের ঘনপল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারধ্বনি সকলি তাহাকে উতলা করিত। এই সঙ্গীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া সে অনতিবিলম্বে এক পাঁচালীর দলের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম যত্নে গান শিখাইতে এবং পাঁচালী মুখস্থ করাইতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহাকে আপন বক্ষপিঞ্জরের পাখীর মত প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্নেহ করিতে লাগিল। পাখী কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যূষে উড়িয়া চলিয়া গেল।

শেষবারে সে এক জিম্ন্যাষ্টিকের দলে জুটিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ় মাসের অবসান পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে পর্য্যায়ক্রমে বারোয়ারির মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে দুই তিন দল যাত্রা, পাঁচালি, কবি,

নর্ত্তকী এবং নানাবিধ দোকান নৌকাযোগে ছোট ছোট নদী উপনদী দিয়া এক মেলা অন্তে অন্য মেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। গত বৎসর হইতে কলিকাতার এক ক্ষুদ্র জিম্ন্যাষ্টিকের দল এই পর্য্যটনশীল মেলার আমোদচক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল। তারাপদ প্রথমতঃ নৌকারোহী দোকানীদের সহিত মিশিয়া মেলায় পানের খিলি বিক্রয়ের ভার লইয়াছিল। পরে তাহার স্বাভাবিক কৌতূহলবশতঃ এই জিম্ন্যাষ্টিকের ছেলেদের আশ্চর্য্য ব্যায়ামনৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া এই দলে প্রবেশ করিয়াছিল। তারাপদ নিজে নিজে অভ্যাস করিয়া ভাল বাঁশী বাজাইতে শিখিয়াছিল—জিম্ন্যাষ্টিকের সময় তাহাকে দ্রুততালে লক্ষ্ণৌ ঠুংরির সুরে বাঁশী বাজাইতে হইত এই তাহার একমাত্র কাজ ছিল।

এই দল হইতেই তাহার শেষ পলায়ন। সে শুনিয়াছিল, নন্দীগ্রামের জমীদার বাবুরা মহা সমারোহে এক সখের যাত্রা খুলিতেছেন—শুনিয়া সে তাহার ক্ষুদ্র বোঁচকাটি লইয়া নন্দী-গ্রামে যাত্রার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় মতিবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।

তারাপদ পর্য্যায়ক্রমে নানা দলের মধ্যে ভিড়িয়াও আপন স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতি প্রভাবে কোন দলের বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। অন্তরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুক্ত ছিল। সংসারের অনেক কুৎসিত কথা সে সর্ব্বদা শুনিয়াছে এবং অনেক কদর্য্য দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু

তাহা তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইবার তিলমাত্র অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। এ ছেলেটির কিছুতেই খেয়াল ছিল না। অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় কোন প্রকার অভ্যাসবন্ধনও তাহার মনকে বাধ্য করিতে পারে নাই, সে এই সংসারের পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মত সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কৌতূহলবশতঃ যতবারই ডুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না। এই জন্য এই গৃহত্যাগী ছেলেটির মুখে একটি শুভ্র স্বাভাবিক তারুণ্য অম্লানভাবে প্রকাশ পাইত, তাহার সেই মুখশ্রী দেখিয়া প্রবীণ বিষয়ী মতিলাল বাবু তাহাকে বিনা প্রশ্নে বিনা সন্দেহে পরম আদরে আহ্বান করিয়া লইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া দিল। অন্নপূর্ণা পরমস্নেহে এই ব্রাহ্মণ বালককে তাহার ঘরের কথা, তাহার আত্মীয় পরিজনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন;—তারাপদ অত্যন্ত সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া বাহিরে আসিয়া পরিত্রাণ লাভ করিল। বাহিরে বর্ষার নদী পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিয়া আপন আত্মহারা উদ্দাম চাঞ্চল্যে প্রকৃতিমাতাকে যেন উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘনির্ম্মুক্ত রৌদ্রে

নদীতীরের অর্দ্ধনিমগ্ন কাশতৃণশ্রেণী, এবং তাহার ঊর্দ্ধে সরস সঘন ইক্ষুক্ষেত্র এবং তাহার পরপ্রান্তে দূরদিগন্তচুম্বিত নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা সমস্তই যেন কোন এক রূপকথার সোনার কাঠির স্পর্শে সদ্যো-জাগ্রত নবীন সৌন্দর্য্যের মত নির্ব্বাক্ নীলাকাশের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্তই যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্‌ভ, আলোকে উদ্ভাসিত, নবীনতায় সুচিক্কণ, প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ।

তারাপদ নৌকার ছাদের উপরে পালের ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইল। পর্য্যায়ক্রমে ঢালু সবুজ মাঠ, প্লাবিত পাটের ক্ষেত, গাঢ় শ্যামল আমন্ ধান্যের আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিমুখী সঙ্কীর্ণ পথ, ঘনবনবেষ্টিত ছায়াময় গ্রাম তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জল স্থল আকাশ, এই চারিদিকের সচলতা, সজীবতা, মুখরতা,—এই ঊর্দ্ধ অধোদেশের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য এবং নির্লিপ্ত সুদূরতা, এই সুবৃহৎ, চিরস্থায়ী, নির্নিমেষ, বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরমাত্মীয় ছিল;—অথচ সে এই চঞ্চল মাণবকটিকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্নেহবাহু দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না। নদীতীরে বাছুর লেজ তুলিয়া ছুটিতেছে, গ্রাম্য টাটুঘোড়া সম্মুখের দুই দড়িবাঁধা পা লইয়া লাফ দিয়া দিয়া ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে, মাছরাঙা জেলেদের জাল বাঁধিবার বংশদণ্ডের উপর হইতে ঝপ্ করিয়া সবেগে জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া মাছ ধরিতেছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়িয়া মাতা-

মাতি করিতেছে, মেয়েরা উচ্চকণ্ঠে সহাস্য গল্প করিতে করিতে আবক্ষজলে বসনাঞ্চল প্রসারিত করিয়া দুই হস্তে তাহা মার্জ্জন করিয়া লইতেছে, কোমর-বাঁধা মেছুনীরা চুপ্‌ড়ি লইয়া জেলেদের নিকট হইতে মাছ কিনিতেছে, এ সমস্তই সে চিরনূতন অশ্রান্ত কৌতূহলের সহিত বসিয়া বসিয়া দেখে, কিছুতেই তাহার দৃষ্টির পিপাসা নিবৃত্ত হয় না।

নৌকার ছাতের উপরে গিয়া তারাপদ ক্রমশঃ দাঁড়ি মাঝিদের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। মাঝে মাঝে আবশ্যকমতে মাল্লাদের হাত হইতে লগি লইয়া নিজেই ঠেলিতে প্রবৃত্ত হইল; মাঝির যখন তামাক খাইবার আবশ্যক, তখন সে নিজে গিয়া হাল ধরিল—যখন যে দিকে পাল্ ফিরান আবশ্যক সমস্ত সে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অন্নপূর্ণা তারাপদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে তুমি কি খাও!

তারাপদ কহিল, যা' পাই তাই খাই; সকল দিন খাইও না।

এই সুন্দর ব্রাহ্মণ বালকটির আতিথ্যগ্রহণে ঔদাসীন্য অন্নপূর্ণাকে ঈষৎ পীড়া দিতে লাগিল। তাঁহার বড় ইচ্ছা, খাওয়াইয়া পরাইয়া এই গৃহচ্যুত পান্থ বালকটিকে পরিতৃপ্ত করিয়া দেন। কিন্তু কিসে যে তাহার পরিতোষ হইবে তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না। অন্নপূর্ণা চাকরদের ডাকিয়া গ্রাম হইতে দুধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য ধূমধাম বাধাইয়া

দিলেন। তারাপদ যথাপরিমাণে আহার করিল; কিন্তু দুধ খাইল না। মৌনস্বভাব মতিলাল বাবুও তাহাকে দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; সে সংক্ষেপে বলিল, আমার ভাল লাগে না।

নদীর উপর দুই তিন দিন গেল। তারাপদ রাঁধাবাড়া বাজার করা হইতে নৌকাচালনা পর্য্যন্ত সকল কাজেই স্বেচ্ছা এবং তৎপরতার সহিত যোগ দিল। যে কোন দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে আসে তাহার প্রতি তারাপদের সকৌতূহল দৃষ্টি ধাবিত হয়, যে কোন কাজ তাহার হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই সে আপনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্ব্বদাই সচল হইয়া আছে; এই জন্য সে এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মত সর্ব্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন অথচ সর্ব্বদাই ক্রিয়াসক্ত। মানুষমাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে;—কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ,—ভূত ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোন বন্ধন নাই—সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য্য।

এ দিকে অনেক দিন নানা সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়া অনেক প্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। কোন প্রকার চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকাতে তাহার নির্ম্মল স্মৃতিপটে সকল জিনিষ আশ্চর্য্য সহজে মুদ্রিত হইয়া যাইত। পাঁচালি, কথকতা, কীর্ত্তনগান, যাত্রাভিনয়ের সুদীর্ঘ খণ্ডসকল

তাহার কণ্ঠাগ্রে ছিল। মতিলাল বাবু চিরপ্রথামত একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার স্ত্রী কন্যাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিলেন; কুশ লবের কথার সূচনা হইতেছে, এমন সময় তারাপদ উৎসাহ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নৌকার ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, বই রাখুন! আমি কুশ লবের গান করি, আপনারা শুনে যান্।

এই বলিয়া সে কুশ লবের পাঁচালী আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মত সুমিষ্ট পরিপূর্ণস্বরে দাশুরায়ের অনুপ্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল;—দাঁড়ি মাঝি সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল; হাস্য, করুণা এবং সঙ্গীতে সেই নদীতীরের সন্ধ্যাকাশে এক অপূর্ব্ব রসস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল,—দুই নিস্তব্ধ তটভূমি কুতূহলী হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া যে সকল নৌকা চলিতেছিল, তাহাদের আরোহিগণ ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিকে কান দিয়া রহিল; যখন শেষ হইয়া গেল সকলেই ব্যথিত চিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহারই মধ্যে শেষ হইল কেন?

সজলনয়না অন্নপূর্ণার ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছেলেটিকে কোলে বসাইয়া বক্ষে চাপিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করেন। মতিলাল বাবু ভাবিতে লাগিলেন, এই ছেলেটিকে যদি কোনমতে কাছে রাখিতে পারি তবে পুত্রের অভাব পূর্ণ হয়। কেবল ক্ষুদ্র বালিকা চারুশশির অন্তঃকরণ ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চারুশশি তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাঁহাদের পিতৃমাতৃস্নেহের একমাত্র অধিকারিণী। তাহার খেয়াল এবং জেদের অন্ত ছিল না। খাওয়া, কাপড়পরা, চুল-বাঁধা সম্বন্ধে তাহার নিজের স্বাধীন মত ছিল, কিন্তু সে মতের কিছু-মাত্র স্থিরতা ছিল না। যে দিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিত সে দিন তাহার মায়ের ভয় হইত পাছে মেয়েটি সাজসজ্জা সম্বন্ধে একটা অসম্ভব জেদ্ ধরিয়া বসে। যদি দৈবাৎ একবার চুল-বাঁধাটা তাহার মনের মত না হইল, তবে সে দিন যতবার চুল খুলিয়া যত রকম করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাক্ কিছুতেই তাহার মন পাওয়া যাইবে না, অবশেষে মহা কান্নাকাটির পালা পড়িয়া যাইবে। সকল বিষয়েই এইরূপ। আবার এক এক সময় চিত্ত যখন প্রসন্ন থাকে তখন কিছুতেই তাহার কোন আপত্তি থাকে না। তখন সে অতিমাত্রায় ভালবাসা প্রকাশ করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া হাসিয়া বকিয়া একেবারে অস্থির করিয়া তোলে। এই ক্ষুদ্র মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।

এই বালিকা তাহার দুর্বাধ্য হৃদয়ের সমস্ত বেগ প্রয়োগ করিয়া মনে মনে তারাপদকে সুতীব্র বিদ্বেষে তাড়না করিতে লাগিল। পিতামাতাকেও সর্ব্বতোভাবে উদ্বেজিত করিয়া

তুলিল। আহারের সময় রোদনোন্মুখী হইয়া ভোজনের পাত্র ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, রন্ধন তাহার রুচিকর বোধ হয় না—দাসীকে মারে, সকল বিষয়েই অকারণ অভিযোগ করিতে থাকে। তারাপদের বিদ্যাগুলি যতই তাহার এবং অন্য সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল, ততই যেন তাহার রাগ বাড়িয়া উঠিল। তারাপদের যে কোন গুণ আছে, ইহা স্বীকার করিতে তাহার মন বিমুখ হইল, অথচ তাহার প্রমাণ যখন প্রবল হইতে লাগিল, তাহার অসন্তোষের মাত্রাও উচ্চে উঠিল। তারাপদ যে দিন কুশলবের গান করিল, সে দিন অন্নপূর্ণা মনে করিলেন, সঙ্গীতে বনের পশু বশ হয়, আজ বোধ হয় আমার মেয়ের মন গলিয়াছে;—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—চারু, কেমন লাগ্‌ল? সে কোন উত্তর না দিয়া অত্যন্ত প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া দিল। এই ভঙ্গীটিকে ভাষায় তর্জ্জমা করিলে এইরূপ দাঁড়ায়:—কিছুমাত্র ভাল লাগে নাই এবং কোন কালে ভাল লাগিবে না!

চারুর মনে ঈর্ষ্যার উদয় হইয়াছে বুঝিয়া তাহার মাতা চারুর সম্মুখে তারাপদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন। সন্ধ্যার পরে যখন সকাল সকাল খাইয়া চারু শয়ন করিত তখন অন্নপূর্ণা নৌকাকক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া বসিতেন এবং মতি বাবু ও তারাপদ বাহিরে বসিত এবং অন্নপূর্ণার অনুরোধে তারাপদ গান আরম্ভ করিত; তাহার গানে যখন নদীতীরের বিশ্রামনিরতা গ্রামশ্রী সন্ধ্যার বিপুল অন্ধ-

কারে মুগ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া রহিত এবং অন্নপূর্ণার কোমল হৃদয়খানি স্নেহে ও সৌন্দর্য্যরসে উচ্ছলিত হইতে থাকিত তখন হঠাৎ চারু দ্রুতপদে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া সরোষ সরোদনে বলিত, মা তোমরা কি গোল করচ আমার ঘুম হচ্চে না। পিতামাতা তাহাকে একলা ঘুমাইতে পাঠাইয়া তারাপদকে ঘিরিয়া সংগীত উপভোগ করিতেছেন ইহা তাহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিত। এই দীপ্তকৃষ্ণনয়না বালিকার স্বাভাবিক সুতীব্রতা তারাপদের নিকট অত্যন্ত কৌতুকজনক বোধ হইত। সে ইহাকে গল্প শুনাইয়া, গান গাহিয়া, বাঁশি বাজাইয়া বশ করিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না! কেবল, তারাপদ মধ্যাহ্নে যখন নদীতে স্নান করিতে নামিত, পরিপূর্ণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সরল তনু দেহখানি নানা সন্তরণভঙ্গীতে অবলীলাক্রমে সঞ্চালন করিয়া তরুণ জলদেবতার মত শোভা পাইত, তখন বালিকার কৌতূহল আকৃষ্ট না হইয়া থাকিত না; সে সেই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত; কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ কাহাকেও জানিতে দিত না, এবং এই অশিক্ষাপটু অভিনেত্রী পশমের গলাবন্ধ বোনা এক মনে অভ্যাস করিতে করিতে মাঝে মাঝে যেন অত্যন্ত উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপদের সন্তরণলীলা দেখিয়া লইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নন্দীগ্রাম কখন্ ছাড়াইয়া গেল, তারাপদ তাহার খোঁজ লইল না। অত্যন্ত মৃদুমন্দ গতিতে বৃহৎ নৌকা কখনো পাল তুলিয়া কখনো গুণ টানিয়া নানা নদীর শাখা প্রশাখার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল;—নৌকারোহীদের দিনগুলিও এই সকল নদী উপনদীর মত, শান্তিময় সৌন্দর্য্যময় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সহজ সৌম্য গমনে মৃদুমিষ্ট কলস্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাহারো কোনরূপ তাড়া ছিল না; মধ্যাহ্নে স্নানাহারে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইত, এদিকে সন্ধ্যা হইতে না হইতেই একটা বড় দেখিয়া গ্রামের ধারে, ঘাটের কাছে, ঝিল্লিমন্দ্রিত খদ্যোতখচিত বনের পার্শ্বে নৌকা বাঁধিত।

এমনি করিয়া দিনদশেকে নৌকা কাঁঠালিয়ায় পৌঁছিল। জমিদারের আগমনে বাড়ি হইতে পাল্কী এবং টাটু ঘোড়ার সমাগম হইল, এবং বাঁশের লাঠি হস্তে পাইক বরকন্দাজের দল ঘন ঘন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে গ্রামের উৎকণ্ঠিত কাকসমাজকে যৎপরোনাস্তি মুখর করিয়া তুলিল।

এই সমস্ত সমারোহে কালবিলম্ব হইতেছে ইতিমধ্যে তারাপদ নৌকা হইতে দ্রুত নামিয়া একবার সমস্ত গ্রাম পর্য্যটন করিয়া লইল। কাহাকেও দাদা, কাহাকেও খুড়া, কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসী বলিয়া দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহার্দ্দ্যবন্ধন স্থাপিত করিয়া

লইল। কোথাও তাহার প্রকৃত কোন বন্ধন ছিল না বলিয়াই এই বালক আশ্চর্য্য সত্বর ও সহজে সকলেরই সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারিত। তারাপদ দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল।

এত সহজে হৃদয়হরণ করিবার কারণ এই, তারাপদ সকলেরই সঙ্গে তাহাদের নিজের মত হইয়া স্বভাবতই যোগ দিতে পারিত। সে কোন প্রকার বিশেষ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না, অথচ সকল অবস্থা সকল কাজের প্রতিই তাহার এক প্রকার সহজ প্রবণতা ছিল। বালকের কাছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বালক, অথচ তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র, বৃদ্ধের কাছে সে বালক নহে অথচ জ্যাঠাও নহে, রাখালের সঙ্গে সে রাখাল অথচ ব্রাহ্মণ। সকলের সকল কাজেই সে চিরকালের সহযোগীর ন্যায় অভ্যস্তভাবে হস্তক্ষেপ করে;—ময়রার দোকানে গল্প করিতে করিতে ময়রা বলে দাদাঠাকুর একটু বস ত ভাই আমি আস্‌চি—তারাপদ অম্লানবদনে দোকানে বসিয়া একখানা শালপাতা লইয়া সন্দেশের মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়। ভিয়ান্ করিতেও সে মজবুৎ, তাঁতের রহস্যও তাহার কিছু কিছু জানা আছে, কুমারের চক্রচালনাও তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে।

তারাপদ সমস্ত গ্রামটি আয়ত্ত করিয়া লইল, কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার ঈর্ষ্যা সে এখনো জয় করিতে পারিল না। এই বালিকাটি তারাপদের সুদূরে নির্ব্বাসন তীব্রভাবে

কামনা করিতেছে জানিয়াই বোধ করি তারাপদ এই গ্রামে এত দিন আবদ্ধ হইয়া রহিল।

কিন্তু বালিকাবস্থাতেও নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা সুকঠিন, চারুশশি তাহার প্রমাণ দিল।

বামুন ঠাকুরুণের মেয়ে সোনামণি পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয়; সেই চারুর সমবয়সী সখী। তাহার শরীর অসুস্থ থাকাতে গৃহপ্রত্যাগত সখীর সহিত সে কিছুদিন সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। সুস্থ হইয়া যে দিন দেখা করিতে আসিল সে দিন প্রায় বিনা কারণেই দুই সখীর মধ্যে একটা মনো-বিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।

চারু অত্যন্ত ফাঁদিয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছিল। সে ভাবিয়া-ছিল, তারাপদ নামক তাহাদের নবার্জ্জিত পরমরত্নটির আহরণ-কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া সে তাহার সখীর কৌতূহল এবং বিস্ময় সপ্তমে চড়াইয়া দিবে। কিন্তু যখন সে শুনিল, তারাপদ সোনামণির নিকট কিছুমাত্র অপরিচিত নহে, বামুন-ঠাকুরুণকে সে মাসী বলে এবং সোনামণি তাহাকে দাদা বলিয়া থাকে, যখন শুনিল, তারাপদ কেবল যে বাঁশিতে কীর্ত্তনের সুর বাজাইয়া মাতা ও কন্যার মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহা নহে, সোনামণির অনুরোধে তাহাকে স্বহস্তে একটি বাঁশের বাঁশি বানাইয়া দিয়াছে, তাহাকে কতদিন উচ্চশাখা হইতে ফল ও কণ্টকশাখা হইতে ফুল পাড়িয়া দিয়াছে তখন চারুর অন্তঃকরণে যেন তপ্তশেল বিঁধিতে লাগিল চারু।

জানিত তারাপদ বিশেষরূপে তাহাদেরই তারাপদ—অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয়—ইতরসাধারণে তাহার একটু আধটু আভাসমাত্র পাইবে অথচ কোনমতে নাগাল পাইবে না, দূর হইতে তাহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইবে এবং চারুশশিদের ধন্যবাদ দিতে থাকিবে। এই আশ্চর্য্য দুর্লভ দৈবলব্ধ ব্রাহ্মণ বালকটি সোনামণির কাছে কেন সহজগম্য হইল? আমরা যদি এত যত্ন করিয়া না আনিতাম, এত যত্ন করিয়া না রাখিতাম তাহা হইলে সোনামণিরা তাহার দর্শন পাইত কোথা হইতে? সোনামণির দাদা! শুনিয়া সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যায়!

যে তারাপদকে চারু মনে মনে বিদ্বেষশরে জর্জ্জর করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারই একাধিকার লইয়া এমন প্রবল উদ্বেগ কেন? বুঝিবে কাহার সাধ্য!

সেই দিনই অপর একটা তুচ্ছসূত্রে সোনামণির সহিত চারুর মর্ম্মান্তিক আড়ি হইয়া গেল। এবং সে তারাপদর ঘরে গিয়া তাহার সখের বাঁশিটি বাহির করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া মাড়াইয়া সেটাকে নির্দ্দয়ভাবে ভাঙ্গিতে লাগিল।

চারু যখন প্রচণ্ড আবেগে এই বংশীধ্বংসকার্য্যে নিযুক্ত আছে এমন সময় তারাপদ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে বালিকার এই প্রলয় মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কহিল "চারু, আমার বাঁশিটা ভাঙ্‌চ কেন?" চারু রক্তনেত্রে রক্তিম-মুখে "বেশ কর্‌চি, খুব কর্‌চি" বলিয়া আরও বার দুই চার বিদীর্ণ বাঁশির উপর অনাবশ্যক পদাঘাত করিয়া উচ্ছ্বসিত

কণ্ঠে কাঁদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারাপদ বাঁশিটি তুলিয়া উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিল তাহাতে আর পদার্থ নাই। অকারণে, তাহার পুরাতন নিরপরাধ বাঁশিটার এই আকস্মিক দুর্গতি দেখিয়া সে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। চারুশশি প্রতিদিনই তাহার পক্ষে পরম কৌতূহলের বিষয় হইয়া উঠিল।

তাহার আর একটি কৌতূহলের ক্ষেত্র ছিল, মতিলাল বাবুর লাইব্রেরিতে ইংরাজি ছবির বইগুলি। বাহিরের সংসারের সহিত তাহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এই ছবির জগতে সে কিছুতেই ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কল্পনার দ্বারা আপনার মনে অনেকটা পূরণ করিয়া লইত কিন্তু তাহাতে মন কিছুতেই তৃপ্তি মানিত না।

ছবির বহির প্রতি তারাপদের এই আগ্রহ দেখিয়া একদিন মতিলাল বাবু বলিলেন, "ইংরিজি শিখ্‌বে? তা হলে এ সমস্ত ছবির মানে বুঝ্‌তে পারবে।" তারাপদ তৎক্ষণাৎ বলিল "শিখ্‌ব।"

মতিবাবু খুব খুসি হইয়া গ্রামের এণ্ট্রেন্স্ স্কুলের হেড্‌মাষ্টার রামরতন বাবুকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই বালকের ইংরাজি অধ্যাপনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তারাপদ তাহার প্রখর স্মরণশক্তি এবং অখণ্ড মনোযোগ লইয়া ইংরাজি শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। সে যেন এক নূতন দুর্গম রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইল, পুরাতন সংসারের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিল না। পাড়ার লোকেরা আর তাহাকে দেখিতে পাইল না; যখন সে সন্ধ্যার পূর্ব্বে নির্জ্জন নদীতীরে দ্রুতবেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া মুখস্থ করিত, তখন তাহার উপাসক বালকসম্প্রদায় দূর হইতে ক্ষুণ্ণচিত্তে সসম্ভ্রমে তাহাকে নিরীক্ষণ করিত, তাহার পাঠে ব্যাঘাত করিতে সাহস করিত না।

চারুও আজকাল তাহাকে বড় একটা দেখিতে পাইত না। পূর্ব্বে তারাপদ অন্তঃপুরে গিয়া অন্নপূর্ণার স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া আহার করিত—কিন্তু তদুপলক্ষে প্রায় মাঝে মাঝে কিছু বিলম্ব হইয়া যাইত বলিয়া সে মতিবাবুকে অনুরোধ করিয়া বাহিরে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা ব্যথিত হইয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিবাবু বালকের অধ্যয়নের উৎসাহে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই নূতন ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন।

এমন সময় চারুও হঠাৎ জেদ্ করিয়া বসিল, আমিও ইংরাজি শিখিব। তাহার পিতামাতা তাঁহাদের খামখেয়ালী কন্যার এই প্রস্তাবটিকে প্রথমে পরিহাসের বিষয় জ্ঞান করিয়া

স্নেহমিশ্রিত হাস্য করিলেন—কিন্তু কন্যাটি এই প্রস্তাবের পরিহাস্য অংশটুকুকে প্রচুর অশ্রুজলধারায় অতি শীঘ্রই নিঃশেষে ধৌত করিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে এই স্নেহ-দুর্ব্বল নিরুপায় অভিভাবকদ্বয় বালিকার প্রস্তাব গম্ভীরভাবে গ্রাহ্য করিলেন। চারু মাষ্টারের নিকট তারাপদের সহিত একত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু পড়াশুনা করা এই অস্থিরচিত্ত বালিকার স্বভাব-সঙ্গত ছিল না। সে নিজে কিছু শিখিল না, কেবল তারাপদর অধ্যয়নে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। সে পিছাইয়া পড়ে, পড়া মুখস্থ করে না, কিন্তু তবু কিছুতেই তারাপদর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া থাকিতে চাহে না। তারাপদ তাহাকে অতিক্রম করিয়া নূতন পড়া লইতে গেলে সে মহা রাগারাগি করিত, এমন কি, কান্নাকাটি করিতে ছাড়িত না। তারাপদ পুরাতন বই শেষ করিয়া নূতন বই কিনিলে তাহাকেও সেই নূতন বই কিনিয়া দিতে হইত। তারাপদ অবসরের সময় নিজে ঘরে বসিয়া লিখিত এবং পড়া মুখস্থ করিত, ইহা সেই ঈর্ষ্যাপরায়ণা কন্যা-টির সহ্য হইত না; সে গোপনে তাহার লেখা খাতায় কালি ঢালিয়া আসিত, কলম চুরি করিয়া রাখিত, এমন কি বইয়ের যেখানে অভ্যাস করিবার, সেই অংশটি ছিঁড়িয়া আসিত। তারাপদ এই বালিকার অনেক দৌরাত্ম্য সকৌতুকে সহ্য করিত, অসহ্য হইলে মারিত, কিন্তু কিছুতেই শাসন করিতে পারিত না।

দৈবাৎ একটা উপায় বাহির হইল। একদিন বড় বিরক্ত হইয়া নিরুপায় তারাপদ তাহার মসীবিলুপ্ত লেখা খাতা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে বসিয়াছিল;—চারু দ্বারের কাছে আসিয়া মনে করিল, আজ মার খাইবে। কিন্তু তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না। তারাপদ একটি কথামাত্র না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকা ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘুর্ ঘুর্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারম্বার এত কাছে ধরা দিল যে, তারাপদ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত বসাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বালিকা মহা মুস্কিলে পড়িল। কেমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কোন কালেই অভ্যাস ছিল না, অথচ অনুতপ্ত ক্ষুদ্র হৃদয়টি তাহার সহপাঠীর ক্ষমালাভের জন্য একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অবশেষে কোন উপায় না দেখিয়া ছিন্ন খাতার এক টুক্রা লইয়া তারাপদর নিকটে বসিয়া খুব বড় বড় করিয়া লিখিল, আমি আর কখন খাতায় কালি মাখাব না। লেখা শেষ করিয়া সেই লেখার প্রতি তারাপদর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেক প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিয়া তারাপদ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না—হাসিয়া উঠিল। তখন বালিকা লজ্জায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া ঘর হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যে কাগজের টুক্রায় সে স্বহস্তে দীনতা প্রকাশ করিয়াছে সেটা অনন্তকাল এবং অনন্ত

জগৎ হইতে সম্পূর্ণ লোপ করিতে পারিলে তবে তাহার হৃদয়ের নিদারুণ ক্ষোভ মিটিতে পারিত।

এদিকে সঙ্কুচিতচিত্ত সোনামণি দুই একদিন অধ্যয়নশালার বাহিরে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে! সখী চারুশশির সহিত তাহার সকল বিষয়েই বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু তারাপদর সম্বন্ধে চারুকে সে অত্যন্ত ভয় এবং সন্দেহের সহিত দেখিত। চারু যে সময়ে অন্তঃপুরে থাকিত, সেই সময়টি বাছিয়া সোনামণি সসঙ্কোচে তারাপদর দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। তারাপদ বই হইতে মুখ তুলিয়া সস্নেহে বলিত, কি সোনা! খবর কি? মাসী কেমন আছে?

সোনামণি কহিত, অনেকদিন যাওনি, মা তোমাকে এক বার যেতে বলেছে। মা'র কোমরে ব্যথা বলে দেখ্‌তে আস্‌তে পারে না।

এমন সময় হয়ত হঠাৎ চারু আসিয়া উপস্থিত। সোনামণি শশব্যস্ত। সে যেন গোপনে তাহার সখীর সম্পত্তি চুরি করিতে আসিয়াছিল। চারু কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিত, "অ্যাঁ সোনা! তুই পড়ার সময় গোল কর্‌তে এসেছিস্‌, আমি এখনি বাবাকে গিয়ে বলে দেব!"—যেন তিনি নিজে তারাপদর একটি প্রবীণা অভিভাবিকা; তাহার পড়াশুনায় লেশমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে রাত্রিদিন ইহার প্রতিই তাহার একমাত্র দৃষ্টি। কিন্তু সে নিজে কি অভিপ্রায়ে এই অসময়ে তারাপদর পাঠগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল,

তাহা অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না এবং তারাপদও তাহা ভালরূপ জানিত। কিন্তু সোনামণি বেচারা ভীত হইয়া তৎ-ক্ষণাৎ একরাশ মিথ্যা কৈফিয়ৎ সৃজন করিত; অবশেষে চারু যখন ঘৃণাভরে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সম্ভাষণ করিত তখন সে লজ্জিত শঙ্কিত পরাজিত হইয়া ব্যথিত চিত্তে ফিরিয়া যাইত। দয়ার্দ্র তারাপদ তাহাকে ডাকিয়া বলিত, "সোনা, আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি তোদের বাড়ি যাব এখন!" চারু সর্পিণীর মত ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিত—"যাবে বৈ কি! তোমার পড়া করতে হবে না? আমি মাষ্টার মশায়কে বলে দেব না?"

চারুর এই শাসনে ভীত না হইয়া তারাপদ দুই একদিন সন্ধ্যার পর বামুন ঠাকৃরুণের বাড়ি গিয়াছিল। তৃতীয় বা চতুর্থ বারে চারু ফাঁকা শাসন না করিয়া আস্তে আস্তে এক সময় বাহির হইতে তারাপদর ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া দিয়া মা'র মসলার বাক্সর চাবি তালা আনিয়া তালা লাগাইয়া দিল। সমস্ত সন্ধ্যাবেলা তারাপদকে এইরূপ বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আহারের সময় দ্বার খুলিয়া দিল। তারাপদ রাগ করিয়া কথা কহিল না এবং না খাইয়া চলিয়া যাইবার উপ-ক্রম করিল। তখন অনুতপ্ত ব্যাকুল বালিকা করযোড়ে সানুনয়ে বারম্বার বলিতে লাগিল, তোমার দুটিপায়ে পড়ি আর আমি এমন করব না! তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি খেয়ে যাও!" তাহাতেও যখন তারাপদ বশ মানিল না, তখন

সে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল; তারাপদ সঙ্কটে পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিল।

চারু কতবার একান্তমনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে তারাপদর সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, আর কখনও তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য বিরক্ত করিবে না, কিন্তু সোনামণি প্রভৃতি আর পাঁচজন মাঝে আসিয়া পড়াতে কখন তাহার কিরূপ মেজাজ্ হইয়া যায় কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। কিছুদিন যখন উপরি উপরি সে ভালমানুষী করিতে থাকে, তখনি একটা উৎকট আসন্ন বিপ্লবের জন্য তারাপদ সতর্কভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আক্রমণটা হঠাৎ কি উপলক্ষে কোন্ দিক্ হইতে আসে কিছুই বলা যায় না। তাহার পরে প্রচণ্ড ঝড়, ঝড়ের পরে প্রচুর অশ্রুবারি-বর্ষা, তাহার পরে প্রসন্ন স্নিগ্ধ শান্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এমনি করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাটিল। এত সুদীর্ঘকালের জন্য তারাপদ কখনো কাহারও নিকট ধরা দেয় নাই। বোধ করি, পড়াশুনার মধ্যে তাহার মন এক অপূর্ব্ব আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াছিল; বোধ করি, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের সুখস্বচ্ছন্দ ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল;

বোধ করি তাহার সহপাঠিকা বালিকার নিয়ত দৌরাত্ম্যচঞ্চল সৌন্দর্য্য অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল।

এদিকে চারুর বয়স এগারো উত্তীর্ণ হইয়া যায়। মতিবাবু সন্ধান করিয়া তাঁহার মেয়ের বিবাহের জন্য দুই তিনটি ভাল ভাল সম্বন্ধ আনাইলেন। কন্যার বিবাহবয়স উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া মতিবাবু তাহার ইংরাজি পড়া এবং বাহিরে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। এই আকস্মিক অবরোধে চারু ঘরের মধ্যে ভারি একটা আন্দোলন উপস্থিত করিল।

তখন একদিন অন্নপূর্ণা মতিবাবুকে ডাকিয়া কহিলেন, "পাত্রের জন্যে তুমি অত খোঁজ করে বেড়াচ্চ কেন? তারাপদ ছেলেটি ত বেশ। আর তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ হয়েছে।"

শুনিয়া মতিবাবু অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "সেও কি কখনো হয়? তারাপদর কুলশীল কিছুই জানা নেই। আমার একটিমাত্র মেয়ে আমি ভাল ঘরে দিতে চাই!"

একদিন রায়ডাঙ্গার বাবুদের বাড়ি হইতে মেয়ে দেখিতে আসিল। চারুকে বেশভূষা পরাইয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হইল। সে শোবার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল —কিছুতেই বাহির হইল না। মতিবাবু ঘরের বাহির হইতে অনেক অনুনয় করিলেন, ভৎর্সনা করিলেন, কিছুতেই কিছু

ফল হইল না। অবশেষে বাহিরে আসিয়া রায়ডাঙ্গার দূতবর্গের নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইল, কন্যার হঠাৎ অত্যন্ত অসুখ করিয়াছে, আজ আর দেখান হইবে না। তাহারা ভাবিল মেয়ের বুঝি কোন একটা দোষ আছে, তাই এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করা হইল।

তখন মতিবাবু ভাবিতে লাগিলেন, তারাপদ ছেলেটি দেখিতে শুনিতে সকল হিসাবেই ভাল; উহাকে আমি ঘরেই রাখিতে পারিব, তাহা হইলে আমার একমাত্র মেয়েটিকে পরের বাড়ি পাঠাইতে হইবে না। ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অশান্ত অবাধ্য মেয়েটির দুরন্তপনা তাঁহাদের স্নেহের চক্ষে যতই মার্জ্জনীয় বোধ হউক শ্বশুর-বাড়িতে কেহ সহ্য করিবে না।

তখন স্ত্রী পুরুষে অনেক আলোচনা করিয়া তারাপদর দেশে তাহার সমস্ত কৌলিক সংবাদ সন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। খবর আসিল যে, বংশ ভাল কিন্তু দরিদ্র। তখন মতি বাবু ছেলের মা এবং ভাইয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সম্মতি দিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কাঁঠালিয়ায় মতিবাবু এবং অন্নপূর্ণা বিবাহের দিনক্ষণ আলোচনা করিতে লাগিলেন,কিন্তু স্বাভাবিক গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবাবু কথাটা গোপনে রাখিলেন।

চারুকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে মাঝে মাঝে বর্গির

হাঙ্গামার মত তারাপদর পাঠগৃহে গিয়া পড়িত। কখনো রাগ, কখনো অনুরাগ, কখনো বিরাগের দ্বারা তাহার পাঠচর্য্যার নিভৃতশান্তি অকস্মাৎ তরঙ্গিত করিয়া তুলিত। তাহাতে আজকাল, এই নির্লিপ্ত মুক্তস্বভাব ব্রাহ্মণ বালকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎস্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার হইত। যে ব্যক্তির লঘুভার চিত্ত চিরকাল অক্ষুণ্ণ অব্যাহতভাবে কালস্রোতের তরঙ্গচূড়ায় ভাসমান হইয়া সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত, সে আজকাল এক একবার অন্যমনস্ক হইয়া বিচিত্র দিবাস্বপ্নজালের মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এক একদিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া সে মতিবাবুর লাইব্রেরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছবির বইয়ের পাতা উল্টাইতে থাকিত; সেই ছবিগুলির মিশ্রণে যে কল্পনালোক সৃজিত হইত তাহা পূর্ব্বেকার হইতে অনেক স্বতন্ত্র এবং অধিকতর রঙীন্। চারুর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিয়া সে আর পূর্ব্বের মত স্বভাবতঃ পরিহাস করিতে পারিত না, দুষ্টামি করিলে তাহাকে মারিবার কথা মনেও উদয় হইত না। নিজের এই নিগূঢ় পরিবর্ত্তন এই আবদ্ধ আসক্তভাব তাহার নিজের কাছে এক নূতন স্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল।

শ্রাবণ মাসে বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া মতিবাবু তারাপদর মা ও ভাইদের আনিতে পাঠাইলেন, তারাপদকে তাহা জানিতে দিলেন না। কলিকাতার মোক্তারকে গড়ের বাদ্য বায়না দিতে আদেশ করিলেন এবং জিনিষপত্রের ফর্দ্দ পাঠাইয়া দিলেন।

আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল। গ্রামের নদী এতদিন শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক একটা ডোবায় জল বাধিয়া থাকিত; ছোট ছোট নৌকা সেই পঙ্কিল জলে ডোবানো ছিল, এবং শুষ্ক নদী-পথে গরুরগাড়ি চলাচলের সুগভীর চক্রচিহ্ন খোদিত হইতেছিল—এমন সময় একদিন, পিতৃগৃহপ্রত্যাগত পার্ব্বতীর মত, কোথা হইতে দ্রুতগামিনী জলধারা কলহাস্যসহকারে গ্রামের শূন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল—উলঙ্গ বালকবালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নৃত্য করিতে লাগিল, অতৃপ্ত আনন্দে বারম্বার জলে ঝাঁপ দিয়া দিয়া নদীকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে লাগিল, কুটীরবাসিনীরা তাহাদের পরিচিত প্রিয়সঙ্গিনীকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল,—শুষ্ক নির্জ্জীব গ্রামের মধ্যে কোথা হইতে এক প্রবল বিপুল প্রাণহিল্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল। দেশ বিদেশ হইতে বোঝাই লইয়া ছোট বড় নানা আয়তনের নৌকা আসিতে লাগিল—বাজারের ঘাট সন্ধ্যাবেলায় বিদেশী মাঝির সঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুই তীরের গ্রামগুলি সম্বৎসর আপনার নিভৃত কোণে আপনার ক্ষুদ্র ঘরকন্না লইয়া একাকিনী দিনযাপন করিতে থাকে, বর্ষার সময়ে বাহিরের বৃহৎ পৃথিবী বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া গৈরিক-বর্ণ জল-রথে চড়িয়া এই গ্রামকন্যকাগুলির তত্ত্ব লইতে আসে; তখন জগ-ত্তের সঙ্গে আত্মীয়তাগর্ব্বে কিছুদিনের জন্য তাহাদের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়, সমস্তই সচল সজাগ সজীব হইয়া উঠে, এবং মৌন

নিস্তব্ধ দেশের মধ্যে সুদূর রাজ্যের কলালাপধ্বনি আসিয়া চারিদিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তুলে।

এই সময় কুড়ুলকাটায় নাগবাবুদের এলাকায় বিখ্যাত রথযাত্রার মেলা হইবে। জ্যোৎস্না-সন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া দেখিল কোন নৌকা নাগরদোলা, কোন নৌকা যাত্রার দল, কোন নৌকা পণ্য দ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্রোতের মুখে দ্রুতবেগে মেলা অভিমুখে চলিয়াছে; কলিকাতার কন্সর্টের দল বিপুলশব্দে দ্রুততালের বাজনা জুড়িয়া দিয়াছে, যাত্রার দল বেহালার সঙ্গে গান গাহিতেছে এবং সমের কাছে হাহাহাঃ শব্দে চীৎকার উঠিতেছে, পশ্চিমদেশী নৌকার দাঁড়িমাল্লাগুলো কেবলমাত্র মাদল এবং করতাল লইয়া উন্মত্ত উৎসাহে বিনা সঙ্গীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে—উদ্দীপনার সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব দিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল চাঁদ আচ্ছন্ন হইল—পূবে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীরবর্ত্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল;—সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে;—মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, [illegible] বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে,

গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর একতীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়াগ্রাম আপন কুটীর দ্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

পরদিন তারাপদর মাতা ও ভ্রাতাগণ কাঁঠালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পরদিন কলিকাতা হইতে বিবিধ সামগ্রী-পূর্ণ তিনখানা বড় নৌকা আসিয়া কাঁঠালিয়ার জমিদারী কাছারির ঘাটে লাগিল এবং পরদিন অতি প্রাতে সোনামণি কাগজে কিঞ্চিৎ আমসত্ত এবং পাতার ঠোঙায় কিঞ্চিৎ আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদের পাঠগৃহদ্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল—কিন্তু পরদিন তারাপদকে দেখা গেল না। স্নেহ প্রেম বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্র-বন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণ-রূপে ঘিরিবার পূর্ব্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তি-বিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।

সম্পূর্ণ।